গুলি অন্যান্য সমুদয় কাজ করে ('ঘ' চিত্র দেখ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীদের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে; এই পাখা উঠার পর দলে দলে স্ত্রী পুরুষ পিপীলিকা গর্ত্ত হইতে বাহির হয়, এবং স্ত্রী পিপীলিকারা ডিম প্রসব করে, প্রসব করার পর পাখা ফেলিয়া দেয়; ইহার পর কিরূপ আকৃতি হয় ('খ' চিত্র) দেখ। পুরুষগুলির পাখা হইলে কিরূপ চেহারা হয় তাহা ('ক' চিত্র) দেখ।

একতা ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। কোন একটা ভারী দ্রব্য একটী পিপীলিকা টানিয়া লইয়া যাইতে না পারিলে বাসায় গিয়া খবর দেয় আর দু দশ জন তার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই জিনিসটাকে লইয়া যায়। কেহ কোন একটা জিনিস পাইলে নিজে কেবল খায় না; বাসায় লইয়া যাইয়া ঘরে জমা করিয়া রাখে, শেষে সমান ভাগ করিয়া খায়। কোন একটা বিপদ আপদে পড়িলে আর দশজনে তৎক্ষণাৎ আসিয়া সাহায্য করে। কোন একটার পীড়া হইলে বা কোন প্রকার আঘাত লাগিলে আর দশজনে আসিয়া শুশ্রূষা করে।

ইহারা আবার কখনও দলবল লইয়া যুদ্ধে বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় অন্য এক প্রকারের পিপীলিকাদের বাসায় গিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধে জিতিতে পারিলে তাহাদের সন্তান সন্ততি সমুদয় ঘাড়ে করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া আসে; এবং যত্নের সহিত আদর করে। শেষে তাহারা ভাল বাসার গুণে নিজেদের দাসত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলকেই আপন বিবেচনা করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিয়া গৃহের সুশৃঙ্খলা রাখে।

পিপীলিকার কাজে লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা খাদ্য দ্রব্য টানিয়া স্বীয় গর্ত্তে লইয়া না যাইতে পারে ততক্ষণ সুস্থির হয় না, কেবলি কাজ করিতেছে। অবশেষে গর্ত্তে নিয়া সুস্থির হয়। পরিশ্রম করিতে ইহারা কখনই কাতর হয় না। শীতকালে ইহারা কোন কাজ করে না; বাসায় বসিয়া কেবল ঘুমায়। অন্যান্য সময়ে পরিশ্রম করিয়া এত খাদ্য সঞ্চয় করে যে খাদ্যের অভাবে শীতকালে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না।

এই ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হই।—(১) সর্ব্বদা পরিশ্রম করা উচিত; ইহারা যেমন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রম করিয়া শীতকালের খাদ্য সঞ্চয় করে, আমাদেরও সেইরূপ ছেলেবেলায় পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করা উচিত যে, যৌবনকালে বিদ্যার বলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি। (২) অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত; একটা কাজে একবারে কৃতকার্য্য না হইলে বার বার চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) শত্রুদিগকে ভালবাসা দ্বারা বশীভূত করা উচিত; ভালবাসার দ্বারা যেমন অপরকে বশীভূত করা যায়, কর্কশ ব্যবহার বা শাসন দ্বারা সেইরূপ করা যায় না। (৪) সকলেরই মধ্যে একতা থাকা উচিত; একজনে একটা কাজ না পারিলে দশজনে পারা যায়। বৃহৎ কোন একটা কাজ করিতে হইলে দশজনের সাহায্য লইতে হয়।

কালার ঘরে ধলা ছেলে।

(ডেনমার্ক দেশীয় একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত)

হরের অনেক দূরে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের এক পাশে একজন চাসা বাস করে। সে কতকগুলি পাতি হাঁস পুষিয়াছে। খিড়কীর পুকুর ধারে আমতলায় হাঁসদের থাকিবার জন্য এক ঘর বানাইয়া দিয়াছে। হাঁসগুলি সারা দিন খায় দায় খেলিয়া বেড়ায়, রাত্রি হইলে আমতলায় নিজেদের ঘরে আসিয়া ঘুমাইয়া থাকে। একবার বর্ষাকাল, আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস হইবে, একটী পাতি হংসী ডিম পাড়িয়াছে। অনেক ডিম পাড়িয়াছিল, তাহার সকল গুলিতে তা দেয় নাই কেবল মাত্র ৬টীতে তা দিতেছে। বেচারির কি কষ্ট! আষাঢ়ান্ত বেলা—দিন গিয়াও যায় না; বেচারি দিন নাই রাত্রি নাই, বসিয়াই আছে। একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকা কি কষ্ট সকলেই বুঝিতে পার। তাহার স্বামী পাতি হংস হাজার হোক পুরুষ, সে আপনার মনে আর দশজন হংস হংসীর সহিত পুকুরের জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে, ভাত খাইবার জন্য "প্যাক্" "প্যাক্" করিয়া গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর যাইতেছে, ছেলেদের ও কুকুরের কাছে তাড়া খাইয়া আবার পুকুরে পলাইয়া আসিতেছে। স্ত্রী যে ডিমে বসিয়া বসিয়া সারা হইতেছে সে দিকে তার বড় দৃষ্টি নাই। কেবল দিনের মধ্যে একবার কি দুবার আসিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পরে পাতিহংসী বলিল;—"আর বাপু পারি না—দেখি দেখি হতভাগা গুলোর বাহির হইবার সময় হলো কি না?" এই বলিয়া দেখে যে সময় হইয়াছে, একটী ডিমের মুখ ভাঙ্গিবামাত্র একটী হাঁস মুখ বাড়াইল। এইরূপে ছেলে মেয়েতে পাঁচটী বাহির হইল। তখন তাহাদের শিক্ষার ভাবনা পড়িল। তারা বলে "পী" "পী" মা বলে "প্যাক্" "প্যাক্"—এইরূপে ডাকিতে শিখাইতে লাগিল। কিন্তু একটী ডিম আর ফোটে না। এমন সময়ে এক প্রতিবেশিনী হংসী একদিন বেড়াইতে আসিয়া বলিল;—"কিগো সই, তোমার ডিমে তা দেওয়া কি ঘুচ্‌বে না?" পাতি হংসী বলিল,—"আর বোন্! নিপ্রাহর কথা বল কেন? একটা কাল শত্রু আর বাহিরে আস্‌তে চায় না। আমিও আর পারি না।" সমাগত হংসী বলিল "দেখি দেখি ডিমে তা দিতে ত এত দিন লাগে না।" দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"ওমা একি! এত বড় ডিমত কারুর দেখি নাই। এ ভাই তোর ডিম নয়।" শুনিয়া পাতি হংসীর মনে বড় চিন্তা হইল। "তাইত আমিও ভাব্‌ছিলাম এ কি? এতদিন লাগে কেন?" সমাগত হংসী বলিল "দেখ ভাই আমাকে কিনিয়া আনিবার পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় এক জজের বাড়ীতে ছিলাম, সেখানে আমাদের সঙ্গে কয়জন পেরু থাকিত—তাহারা খুব বড় বড় ডিম পাড়ে, আমার বোধ হয় এ পেরুর ডিম।" হংসী বলিল "যাহা হোক্ এত দিন গেছে না হয় আরও দুই দিন যাবে; দেখি কেমন ছেলে বাহির হয়—জলে লইয়া গেলেই পেরু কি না ধরা পড়িবে।" প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল—হংসী বসিয়া বিষণ্ণ মনে তা দিতে লাগিল। ক্রমে এক প্রকাণ্ড পুরুষ হংস বাহির হইল। পাতি হাঁসের ঘরে এত বড় ছেলে কেউ কখনও দেখে নাই। হংসী দেখিয়া মনে মনে

বলিল—"পোড়া কপাল! কি একটা কদাকার প্রকাণ্ড ছেলে হইল। একে লোক-সমাজে লইয়া যাওয়াও লজ্জা।" যাহা হউক মনের ভাব মনে গোপন করিয়া হংসী কয়েক দিনের মধ্যেই ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে লইয়া পুকুরের দিকে গমন করিল; মনের অভিপ্রায়, পুকুরে তাহাদিগকে সাঁতার শিখাইয়া পাড়া পড়সীর নিকট লইয়া যাইবে। হংসী ছানাগুলিকে একত্র করিয়া বলিল "দেখ এইবার তোমাদিগকে জলে লইয়া যাইব, জল দেখিয়া ভয় পাইও না, সাঁতার দেওয়া আমাদের জাতির স্বধর্ম্ম; প্রথমে নামিবা মাত্র তোমরা ডুবিয়া যাইবে তখন ভয় পাইও না, তৎক্ষণাৎ আবার ভাসিয়া উঠিবে; ও তখন আমার দিকে দেখিও, আমি যেমন করিয়া পা নাড়ি তেমনি করিয়া পা নাড়িবে, তাহা হইলে সাঁতার দিতে পারিবে। সেখানে তোমাদের বাবা সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিতে পাইবে।" ছানাগুলি "পাঁ" "পাঁ" করিয়া সে কথায় সায় দিল। কিন্তু কদাকার ছেলেটীর বড় নিগ্রহ! এমন কি তাহার ভাই ভগিনীরা তাহাকে নড়িতে চড়িতে তামাসা করে। কেহ বলে "মরণ আর কি, হাঁটিবার ধরণ দেখ।" কেহ বলে "রাম রাম সে দিনের ছেলে, শরীরটা দেখ! যেন একটা বুড়ো।" কেহ বলে "তুই আমাদের সঙ্গে আসিস্ নে।" এই বলিয়া দুই তিন জনে তাহার ঘাড় কামড়াইয়া মারিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দেয়। মা ফিরিয়া "প্যাঁক্" "প্যাঁক্" স্বরে তিরস্কার করেন। বলেন "আহা যেঠের বাছা যদি হয়েছে ত বেঁচে থাক্, তোরা কেন ওরে মারিস্?" কদাকার ছানাটী বিষণ্ণ ভাবে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পুকুরের কাছে গিয়া হংসী লম্ফ দিয়া জলে পড়িল, ছানাগুলি দেখাদেখি সেই লম্ফ দিল, অমনি তলাইয়া গেল; ভয়ে ওলট পালট খাইয়া আবার ভাসিয়া উঠিল। তখন মায়ের উপদেশ মত সাঁতার দিতে লাগিল। হংসী দেখে কদাকার ছেলেটীও বেশ সাঁতার দিতেছে, তখন দুশ্চিন্তা দূর হইল। ভাবিল "বাঁচ্লাম। আহা আমার বাছা পেক্ষ হতে গেল কেন?" তখন হাঁসেরা ভাত খাইতে গিয়াছিল; হংসীর আর দেরি সয় না; এমন সব সুসন্তান তাহাদিগকে লোক-সমাজে পরিচিত করিয়া না দিলে মন তৃপ্ত হয় না। পুষ্করিণী হইতে পাড়ে বসিয়া ডানা ঝাড়িয়া ছানাদিগকে ডানা ঝাড়িতে শিখাইল; বলিল: "সাবধান! লোক-সমাজে যাইতেছ অসভ্যতা করিও না, গুরুজনদিগকে পা দেখাইও না, অকারণ "পাঁ" "পাঁ" করিও না। আর সেখানে একজন বড়লোকের স্ত্রীকে দেখিবে, তাঁহার পায়ে রাঙ্গা সূতা বাঁধা, তিনি বড় ঘরের মেয়ে, তাহার দাম অনেক, পাছে হারাইয়া যান বলিয়া গৃহস্থ পায়ে সূতা বাঁধিয়া দিয়াছে! তাঁহার কাছে গিয়া সভ্য ভব্য হইয়া থাকিবে।" এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া শাবকসঙ্গে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি হাঁসেরা সকলে আসিয়া ছেলেদিগকে আদর করিতে লাগিল। কেহ বলে "আহা! কি সুন্দর ছেলেগুলি!" কেহ বলে "সোণার চাঁদ" কেহ বলে "আহা বেঁচে থাক।" কিন্তু কদাকার ছানাটীকে দেখিয়া সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। বলে "একি ভাই, হাঁসের ঘরে এমন কদাকার ছেলে ত দেখি নাই।" লাল সূতা বাঁধা হংসীর বড় আদর! তিনি আর চক্ষু-লজ্জা করিলেন না। বলিলেন "ও গো অমুকের মা, ও ছেলেটা কি তোমার?" "হাঁ দিদি কপাল ক্রমে ওই একটা কদাকার ছেলে হয়েছে কি

করি।" লাল সুতা বাঁধা হংসী বলিল—"ছি! এমন কদাকার ছেলে লইয়া তোমার লোক-সমাজে আসা উচিত হয় নাই, ঘরে রাখিয়া আসিতে পার নাই? সে বলিল:—"আর দিদি আমি গরিব আমার ছেলে দেখে কে? বিশেষতঃ ওদের বিড়ালটা বড় দুষ্ট।" লাল সুতা বাঁধা হংসী বলিল—"তা বলিলে কি হয়, আর আমার কাছে ওকে আনিও না।" এই বলিয়া একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া মাটিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দিল। মা বেচারি কি করে, বড়লোকের স্ত্রীকে কিছু বলিতে পারে না, কাজেই সহ্য করিতে হইল।

কদাকার ছানাটী এইরূপ যার তার নিকট অপমান গঞ্জনা আর সহিতে না পারিয়া মনের দুঃখে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী এক খড়িবনের ভিতর চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল লোকালয়ে থাকিয়া গঞ্জনা সহ্য করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াই ভাল। সেখানে গিয়া কতকগুলি বাইল-হাঁসের সহিত তাহার আলাপ হইল। সে আপনার দুঃখের কাহিনী সমুদায় বলিল;—তাহারা মনে মনে বলিল "যে কদাকার! গঞ্জনা দিবেই ত।" যাহা হউক আতিথ্যের অনুরোধে মনের ভাব মনে গোপন করিয়া বলিল "আচ্ছা যদি আমাদের শরণাপন্ন হইয়াছ তবে এই বনে থাক, চরিয়া বেড়াও। কিন্তু কোনরূপ অভদ্রতা করিলে তাড়াইয়া দিব।" বেচারা এখানেও ভয়ে ভয়ে থাকে, একা একা বেড়ায়। যাহা হউক প্রত্যহ উঠিতে বসিতে তাড়া খাওয়াটা ঘুচিয়া গেল।

একদিন কদাকার হংস খড়িবনে নির্ভয় মনে পাতাড়ির কচি কচি ডাঁটা খাইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে ও কি শব্দ! বন্দুকের আওয়াজ! বেচারা জীবনে ওরূপ ধ্বনি কখন শুনে নাই। শুনিয়াইত হৃৎকম্প উপস্থিত! ভাবিবার সময় না পাইতে পাইতে বাইল হাঁসের ঝাঁক উড়িয়াছে; আবার আওয়াজ, এক নিমেষের মধ্যে একটী রক্তাক্ত হাঁস তাহার সন্নিকটে খড়িবনে মরিয়া পড়িল। কদাকার হংস ভয়ে সরিতে সরিতে খড়িবনে অদৃশ্য হইয়া গেল। শেষে মনে করিল "এখানে থাকাতে বিপদ আছে; দূর হোক এ দেশটা ছাড়িয়া যাই।" খড়িবন হইতে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে আর এক দিকে যাইবার জন্য যাত্রা করিল। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি, ডানা ছিঁড়িয়া যায়, মুখ থুবড়িয়া পড়ে, আর চলিতে পারে না। অবশেষে এক বুড়ীর আগড়ের পাশ দিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে গিয়া এক তক্তার আড়ালে লুকাইয়া রহিল। রাত্রিটা কাটিয়া গেল। সে বুড়ীর সংসারে কেহ নাই কেবল এক পোষা শালিক পাখী আছে, সে মানুষের মত কথা কয়; আর একটী পোষা বিড়াল সে পাখী ধরে না। এই দুইটী বুড়ীর ঘরে রাজত্ব করে। সকালবেলা শালিকটী বকিতে বকিতে কোণের দিকে আসিয়া কদাকার হংসকে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। তখন সে বিড়াল মহাশয়কে ডাকিয়া আনিল, এবং দুইজনে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ করিল। যখন তাহারা তাড়াইবার উপক্রম করিতেছে তখন বুড়ী উপস্থিত হইয়া হংস দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল, আপনার সহচরদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল "তাড়াস্‌নে, থাক্, ডিম দিবে"। বিড়াল ও শালিক অগত্যা সে প্রস্তাবে সম্মত হইল; কিন্তু হংসের উপরে অপ্রসন্ন থাকিয়া গেল।

এখানে আসিয়া কদাকার হংসের বড় বিপদ

হইল। সে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বুড়ী বাহির হইবার সময় তাহাকে বন্ধ করিয়া যায়, ঘরে থাকিবার সময় চোখে চোখে রাখে। বিশেষ বুড়ীর বাড়ী হইতে পুকুর অনেক দূর, বুড়ী সেখানে তাহাকে যাইতে দেয় না। বেচারা কি করে অধিকাংশ সময় ঘরের কোণে কাটায়। এবং বড় বিষণ্ণ থাকে। একদিন শালিক তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা তুমি এত বিষণ্ণ থাক কেন?" কদাকার হংস বলিল "ভাই একটু জলে বেড়াইতে পারিনা, মনটা বড় কেমন করে।" শালিক বলিল—"কি পাগলের মত কথা কও, পাখী কি আবার জলে বেড়ায়" হংস—"হাঁ ভাই আমাদের জাত জলে বেড়ায়।" শালিক—"ঐ জন্যই ত আমরা তোমাকে ঘৃণা করি। আচ্ছা আমাদের বিড়াল একজন বহুদর্শী ও পরম জ্ঞানী লোক তাহাকে ডাকিয়া আনি, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সে জলে বেড়ায় কি না, কিম্বা কাহাকেও বেড়াইতে শুনিয়াছে কি না। যে কথা নয় তাহা বল কেন? তোমার কোন যোগ্যতা নাই লাভের মধ্যে মিথ্যা কথা কও। তুমি না ডিম পাড়িতে পার, না মানুষের মত কথা বলিতে পার, না উমুন কাঁধায় শুইয়া বিড়ালের ন্যায় ঘোঁড় ঘোঁড় করিতে পার। ইহার উপরে আবার মিথ্যা কথা কও।" এই বলিয়া শালিক বিড়ালকে ডাকিয়া আনিল। বিড়াল বলিল—"একি কথা! পাখী কি জলে যায়? ও কথা শুনিতে নাই!" সে দিন হইতে সে তাহাদের বিশেষ অপ্রিয় হইল। বুড়ীও দেখিল বহু দিন গেল তবু ডিম দেয় না, শেষে তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। শালিক ও বিড়াল বাঁচিল।

কদাকার হংস ছাড়া পাইয়া পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় গ্রামের একদল ছেলে তাহাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল "ওরে ভাই বাবুদের হাঁস কি করে আসিয়া পড়িয়াছে, চল ধরে দিয়ে আসি, বক্‌সিস্ পাইব।" এই বলিয়া পাঁচ সাত জন ছেলেতে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে ধরিল ও জমিদার বাবুদের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাবুদের বাগানে এক পাল রাজহংস চরিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র কদাকার হংসের প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। বাবুরা বালকদিগকে বক্‌সিস্ দিয়া তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যেই তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; অমনি রাজহংসগণ গলা লম্বা করিয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেহ বলিল "আহা এমন সুপুরুষ কোথা হইতে আসিল।" কদাকার হংস নিজের আদর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের সঙ্গে পুকুরের জলে গিয়া নির্ম্মল জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"ধাঃ আমিও যে রাজহংস।" সে পাতি হাঁসদিগের গঞ্জনা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যথাসময়ে একটী রাজহংসীর সহিত তাহার বিবাহ হইল। পরে জানা গেল যে, একটী দুষ্ট বালক একটী রাজহংসের ডিম চুরি করিয়া ঐ চাষার পাতি হাঁসের বাসায় রাখিয়া আসিয়াছিল।

উপদেশ;—গুণের আদর গুণী লোকেই করিয়া থাকে।

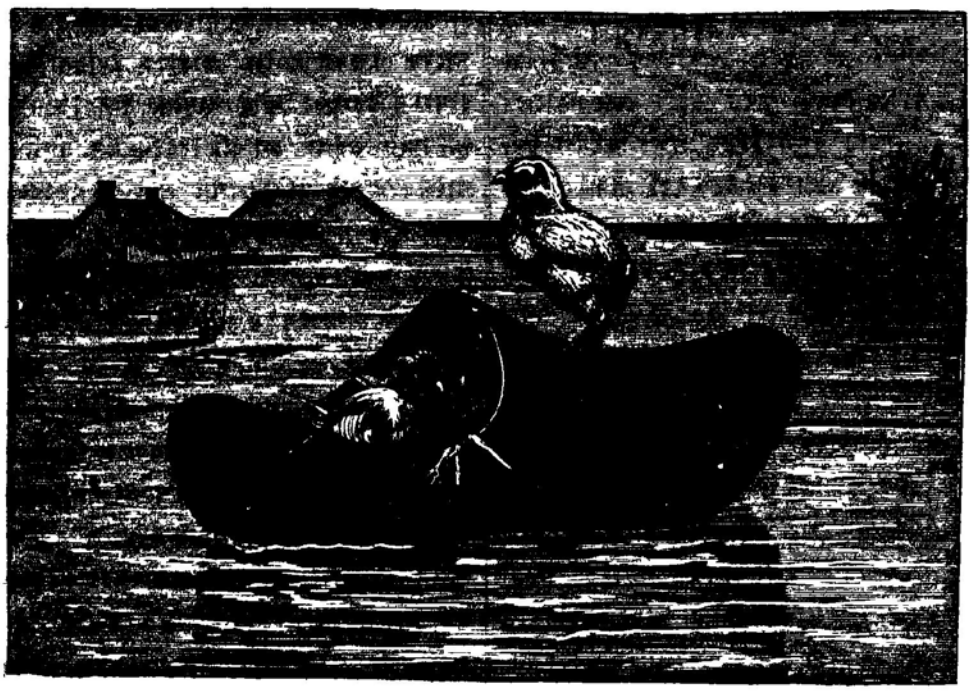

(এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

সাধের নৌকা।

সামাল সামাল, ওই ডেকে আসে বাণ,
দেশ ছেয়ে আসে ধেয়ে জল কাণে কাণ!
নিমেষে নিমেষে বাড়ে কে কোথা পালায়,
তরাসে সকল জীব হাবু ডুবু খায়।
ঘর দোর পড়ে গেল ভেসে যায় চাল,
ডুবিল গাছের গোড়া জেগে আছে ডাল।
জলে জলে একার্ণব যে দিকেতে চাই,
পৃথিবী সাগর হ'লো এ বড় বালাই!
হেনকালে দেখ চেয়ে সাধের নৌকায়,
চড়িয়া কয়টী শিশু সুখে ভেসে যায়।
এক মায়া বসেছেন ছত্রির উপরে;
কয় জন দেখিছেন বসিয়া ভিতরে।
টানে পড়ে ছোটে তরি, হু হু করে ধায়,
আরোহীতে কয় জনে বসিয়া তাহায়।
এমন অপূর্ব্ব তরি কে দেখেছে কবে?
এ তরির ইতিহাস শুন কিছু তবে।
আছিল কৃষক এক যুবতী পুষিত,
পরিয়া কাঠের জুতা কাদাতে চষিত।
আসিলে বন্যার জল কে কোথা ছুটিল,
যুবতী শাবক ছাড়ি কোথা পলাইল!
ছানাগুলি জলে পড়ি না দেখে উপায়,
অবশেষে লম্ফ দিয়া উঠিল জুতায়।
এলো জল ভাসে জুতা নৌকার মতন,
আরোহী হইল তাতে এই কয় জন।
বড়রা ডুবিয়া মলো; ছোটরা বাঁচিল,
ভাসিতে ভাসিতে তরি ডাঙ্গাতে লাগিল।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

বড়লোক হইতে তোমার, আমার সকলেরই ইচ্ছা করে; ঘরে বসিয়া আছি হঠাৎ একেবারে কতকগুলি টাকা পাইলাম আর অমনি বড়লোক হইয়া গেলাম এইরূপই অনেকেরই ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা প্রায়ই সফল হয় না।—

দুই রকম লোককে সচরাচর সকলে বড়লোক বলে। এক, যাহাদের অনেক টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে; আর যাহারা বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে বড়লোক বলা যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের বড়লোকেরই মান, সম্ভ্রম পৃথিবীতে বেশী। সময়ের মূল্য বুঝা চাই; সময় অপব্যয় করিলে কি ক্ষতি হয় এবং কাজে লাগাইলে কি উপকার হয় ইহা না বুঝিলে এই প্রকারের বড় লোক হওয়া যায় না।

যেমন কোন একটী ক্ষেত্র কোনরূপ চাষ না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী অতি শীঘ্রই পতিত হইয়া যায় অথবা কাঁটা গাছ, জঙ্গল কেবলমাত্র উৎপন্ন করে, আর যদি পরিশ্রম করিয়া মাটি চাষ করিয়া তাহাতে ভাল বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে উত্তম শস্য উৎপাদন করে। সেইরূপ যাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা মনের উন্নতির দিকে চেষ্টা না করেন, বৃথা গল্প করিয়া সময় কাটান, তাহাদের মনে কাঁটা গাছরূপ কুভাব উদয় হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মনকে নানা প্রকার পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে; আর যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া ছেলেবেলা হইতেই বৃথা সময় না কাটাইয়া পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা মনের উন্নতি করেন তিনিই শেষে বিদ্যা বুদ্ধির গুণে বড়লোক হন।

সময় অমূল্য, একবার সময় নষ্ট করিলে, আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না। যদিও প্রথমে সময় বৃথা কাটাইয়া পরে কঠিন পরিশ্রম করিয়া প্রথমে যে কাজ করা উচিত ছিল তাহা করা যাইতে পারে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে অত দিন বাঁচিয়া থাকিয়া পরিশ্রম করিবার সময় সকলেই পাইবে? মানুষের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী; এখন হাসিতেছি, খেলিতেছি, কাল হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারি। কোন কালেই সময়ের অপব্যবহার কোন মতেই করা উচিত নহে। পরে কঠিন পরিশ্রম করিব এখন বৃথা আমোদ করি, কখনই এরূপ ভাবে সময় কাটান উচিত নহে।

সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইলে সর্ব্বদা কোন না কোন কাজে মনকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। যাহারা কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবলমাত্র শুইয়া বসিয়া সময় কাটায় তাহাদের মনে প্রথমতঃ কুচিন্তার উদয় হয়, পরে কুকাজ করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল হয়। মন্দ হওয়া বড় সহজ, ইচ্ছা করিলে যত শীঘ্র মন্দ হওয়া যায় কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, ইচ্ছা করিলে তত শীঘ্র ভাল হওয়া যায় না। কাজেই যাহাদের কোন কাজই থাকে না তারাই অতি সহজে মন্দ হইয়া পড়ে। কোন কাজ না থাকিলেই নিজের সময় কাটাইবার জন্য প্রথমতঃ পরের নিন্দা ভাল লাগে, পরের কুৎসা বলিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, শেষে পরের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা হয়, অনেক মন্দ কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ক্রমশঃ ঘোর পাপী হইতে হয়। নিষ্কর্ম্মা লোকদের নিকট একদিন এক বৎসর

বলিয়া বোধ হয়। এই দীর্ঘ সময় কাটাইবার জন্য কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আলস্যই পাপের মূল। আর যাহারা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত তাহারা কুচিন্তা করিবার সময়ও পায় না। সময়ের সদ্ব্যবহারে যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া বড় লোক হওয়া যায় তেমন স্বভাবও নির্ম্মল থাকে।

পৃথিবীতে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে যদি চাও, তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার কর; বৃথা সময় নষ্ট করিও না। বৃথা আমোদ, আহ্লাদ, গল্প পরিত্যাগ করিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞ হইবার চেষ্টা কর।

উচ্চ বংশে যাহাদের জন্ম তাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহারাই যত্ন করিলে লেখা পড়া শিখিতে পারেন আর নীচ জাতীয়দের সন্তানেরা চেষ্টা করিলেও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে যে যাহাদিগকে আমরা 'ছোটলোক' বলি তাহারাও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া লেখা পড়ায় শ্রেষ্ঠ হইয়া বড়লোক হইয়াছেন।

ছোট বড় সব জাতিতেই সময়ের উচিত ব্যবহার করিলে বড় লোক হইতে পারে। এই পথে জাতি বিচার নাই। যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন তিনিই বড়লোক হইবেন।

যদি বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় লোক হইতে চাও তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

ধাঁধা।

জুন মাসের ধাঁধার উত্তর।

আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড় হইতে তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিল। তিনসেরী ভাঁড়ের তৈল আটসেরীতে রাখিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল তিনসেরীতে রাখিল। এখন আট সেরী ভাঁড়ে ছয় সের ও তিন সেরী ভাঁড়ে দু সের রহিল। তৎপর আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাড় পূর্ণ করিল এবং আট সেরী ভাঁড়ে এক সের তৈল রহিল। পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা তিন সের ভাঁড় পূর্ণ করিল, এখন আট সেরী ভাঁড়ে এক সের, পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের এবং তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ রহিল। এখন তিন সেরী ভাঁড়ের তৈল আট সেরীতে ঢালিল; সুতরাং আট সেরীতে চারি সের ও পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের রহিল। দুই জনেরই সমান হইল।

নূতন।

১। হস্ত পদ নাহি তার নাহি বাক শক্তি,
কৌশলেতে কথা কয় বুঝে কার শক্তি।
পবন সমান হয় তাহার গমন,
বিদ্যুৎ আকার তার সমস্ত লক্ষণ।

২। এক জমিদারের ১৮টী ঘোড়া ছিল; মরিবার সময়ে উইল করিয়া গেলেন যে তাঁহার প্রথম পুত্র ½ একার্দ্ধ পাইবে; দ্বিতীয় পুত্র ⅓ এক-তৃতীয়াংশ পাইবে; এবং তৃতীয় পুত্র ⅑ এক নবমাংশ পাইবে। মৃত্যুর পর একটী ঘোড়া মরিয়া গেল। উইলের 'এক্সিকিউটার' কি প্রকারে ঘোড়া ভাগ করিবেন?

অক্টোবর, ১৮৮৫।

মহাভারতের উপদেশ।

দুইটী গল্প।

আমাদের দেশের বালকেরা প্রাচীনকালে যেরূপে বিদ্যাভ্যাস করিত, তাহা একবার বলিয়াছি। তখন বালকদের বাবুগিরি ছিল না। কেহ গাড়ীতে বা পাল্কীতে চড়িয়া স্কুলে আসিত না। সকলেই গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। এই ব্রহ্মচর্য্যের কথা 'সখা'র পাঠকদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজ এ সম্বন্ধে দুইটী গল্প বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে অয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিল। অদ্য আরুণি ও উপমন্যুর কথা বলিব। পূর্ব্বে বালকেরা কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ আত্ম-সংযম অভ্যাস করিত, সরল চিত্তে কিরূপে গুরুর আদেশ প্রতিপালনে যত্নশীল হইত, এবং নানা কষ্ট সহিয়া কিরূপে গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিত, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

আয়োদধৌম্য বড় একটা সদয়প্রকৃতি ছিলেন না। শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট সহিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কাজে নিযুক্ত করিতেন। শিষ্যগণ ছেলেবেলা হইতেই পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এক দিন আরুণিকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন। আরুণি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া আলি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও আলি বাঁধিতে পারিল না। তখন নিজে সেই খানে শুইয়া জলের পথ রোধ করিল। এইরূপে অনেক সময় গেল, আরুণি আর কিছুতেই সেইখান হইতে উঠিল না। আলি বাঁধিতে অক্ষম হওয়াতে গুরুর আদেশ প্রতিপালন জন্য নিজেই আলি স্বরূপ হইয়া তথায় শুইয়া রহিল। পরে কোন সময়ে গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞাসিলে তাহারা কহিল, "আরুণি আপনার আদেশে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে গিয়াছে।" গুরু কহিলেন, "যেখানে আরুণি গিয়াছে, চল আমরাও সেখানে যাই।" আয়োদধৌম্য সেইখানে উপস্থিত হইয়া আরুণিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস আরুণি, কোথায়

গিয়াছ, আমার কাছে আইস।" আরুণি গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিয়া অতি বিনীতভাবে গুরুকে কহিল, "ক্ষেত্র হইতে যে জল বাহির হইতেছিল, তাহা কিছুতেই বারণ করিতে পারি নাই, এজন্য আমি নিজে শুইয়া সেই জলরোধ করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় উঠিয়া আসিলাম। অভিবাদন করি, আর কি আদেশ পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" আয়োদধৌম্য শিষ্যের এইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও গুরুভক্তি দেখিয়া কহিলেন, "বৎস তুমি যথাসাধ্য আমার আদেশ পালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি শস্যক্ষেত্রের আলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য আজ হইতে তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।" আরুণি এইরূপে সেবা শুশ্রূষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর পাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আয়োদধৌম্যের উপ-
মন্যু নামে আর একটী শিষ্য ছিল। এখন সেই উপমন্যুর কথা বলিতেছি। গুরু উপমন্যুকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপমন্যু সমস্ত দিন গোরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিত; এবং অতি বিনীতভাবে গুরুকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। একদিন গুরু তাহাকে মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু, তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।" উপমন্যু কহিল, "গুরুদেব! এখন আমি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করি।" ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন, "দেখ, ভিক্ষাতে যাহা পাও, আমাকে না জানাইয়া তাহা তোমার আহার করা উচিত নয়।" উপমন্যু গুরুর এই কথায় পরদিন হইতে ভিক্ষায় যাহা পাইত সমুদয় গুরুর কাছে আনিয়া দিত। গুরু সমুদয়ই নিজে লইতেন। তাহাকে খাইতে কিছুই দিতেন না। উপমন্যু ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া গুরুর আদেশে পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। একদিন গুরু তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি ভিক্ষায় যাহা পাও, সমুদয় আমি লইয়া থাকি, তোমাকে কিছুই খাইতে দিই না, অথচ তোমাকে মোটা দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।" উপমন্যু কহিল, "একবার ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই আনিয়া আপনারে দিই, আর একবার কয়েক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিয়া থাকি।" গুরু কহিলেন, "দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম নয়, তুমি নিজে দুইবার ভিক্ষা করিলে গৃহস্থ আর কাহাকেও ভিক্ষা দিবে না। ইহাতে অপর ভিক্ষুকদিগের কষ্ট হইবে, তোমারও লোভ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব তুমি আর কখন দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিও না।" উপমন্যু গুরুর এই আদেশে দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিতে নিরস্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে গোচারণ করিতে লাগিল। গুরু দেখিলেন—উপমন্যু কৃশ না হইয়া ক্রমেই বেশী মোটা হইতেছে; এজন্য তাহাকে আর একদিন কহিলেন, "বৎস। তোমার সমস্ত ভিক্ষান্ন লইয়া থাকি, আমার আদেশে তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও কর না, অথচ তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার কর, জানিতে ইচ্ছা করি।" উপমন্যু কহিল, "গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।" গুরু কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে অনুমতি করি নাই, আমার অনুমতি না লইয়া

দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে।" উপমন্যু ইহাতে লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। এদিকে গুরু তাহাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিয়া আর একদিন কহিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছি, অথচ তোমাকে স্থূলকায় দেখা যাইতেছে, এখন কি আহার কর?" উপমন্যু কহিল, "গো-বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া মুখ হইতে যে ফেণ বাহির করে, আমি তাহা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।" গুরু ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ইহাতে গো-বৎসগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়, অতএব ফেণ পান করাও তোমার উচিত নয়।" উপমন্যু গুরুর এই আদেশ পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। সে গুরুর আদেশে ভিক্ষান্ন খাইত না, দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও করিত না; এখন গাভীর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেণ খাইতেও বিরত হইল। এইরূপে অনাহারী হইয়া গোরু চরাইতে চরাইতে উপমন্যু একদিন ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়া পড়িল। নিকটে একটী আকন্দ গাছ ছিল, ক্ষুধার জ্বালায় উপমন্যু তাহার পাতা খাইল, সেই আকন্দ গাছের কটু তিক্ত পাতা খাওয়াতে তাহার চক্ষুর দোষ জন্মিল। উপমন্যু অন্ধ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটী কূপে পড়িয়া গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপমন্যু গোরু চরাইয়া আয়োদধৌম্যের নিকট উপস্থিত হইত। কিন্তু কূপে পড়িয়া যাওয়াতে সেদিন সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে যাইতে পারিল না। গুরু উপমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, "উপমন্যু এখনও আসিতেছে না, আমি তাহাকে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি। বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই জন্য ফিরিতেছে না, চল আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।" ইহা কহিয়া গুরু শিষ্যগণের সহিত বনে যাইয়া "বৎস উপমন্যু, কোথায় গিয়াছ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপ হইতে গুরুর স্বর শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "গুরুদেব! আমি কূপে পতিত হইয়াছি।" আয়োদধৌম্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"আকন্দ পাতা খাওয়াতে অন্ধ হইয়া কূপে পড়িয়া গিয়াছি।" গুরু কহিলেন, "দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাঁহারা তোমার চক্ষুদান করিবেন।" উপমন্যু গুরুর আদেশে সংযত চিত্তে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার যুগল স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানে আসিয়া উপমন্যুকে কহিলেন, "আমরা তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়া এই পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর।" উপমন্যু কহিল, "আপনাদের কথা অবহেলা করা উচিত নয়, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক খাইতে পারি না।"

ইহা শুনিয়া অশ্বিনীতনয় দ্বয় কহিলেন, "পূর্ব্বে তোমার গুরুও আমাদিগের স্তব করিয়াছিলেন। আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি পিষ্টক দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা খাইয়াছিলেন। তোমার গুরু যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।" উপমন্যু কাতরস্বরে বলিল, "আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক খাইতে পারিব না।" অশ্বিনীকুমার যুগল কহিলেন, "তোমার এইরূপ অসাধারণ গুরুভক্তি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার চক্ষু লাভ হউক। কখনও যেন তোমার কোন অম

জল না হয়।" উপমন্যু এইরূপে চক্ষু রত্ন পাইয়া গুরুর কাছে আসিয়া অতি বিনীতভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। গুরু প্রীত হইয়া কহিলেন, "দেববৈদ্যগণ যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপ তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকারী হও।" এইরূপে উপমন্যুর পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

দুই ভাই।

অমৃত ও সুরেন দুই ভাই এক রবিবারে বসিয়া গল্প করিতেছে। নানা প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে:—'স্কুলের অমুক ছেলেটী বড় ভাল, কিন্তু তার একটা দোষ, সে অহঙ্কারী, কারও সঙ্গে মন খুলে কথা কয় না। অমুক মাষ্টারটী বড় মারেন, ভারি রাগী, একদিন অমৃতকে মারিতে গিয়াছিলেন, দূর হইতে সুরেন তা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল'—ইত্যাদি ইত্যাদি কত সব কথা হইতেছিল। এমন সময়ে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মা—"কি কথা হইতেছে, অমৃত?

অমৃত—"এই সব স্কুলের কথা আর ছেলেদের কথা, আর কিছু না।"

মা—"মিছামিছি সময়টা নষ্ট করা কি ভাল?"

সুরেন—"তা, মা! আজ ত আর স্কুলের পড়া নাই; মাষ্টার মহাশয়ও আসিবেন না?"

মা—"আজিকার পড়া নাই বা থাকিল? আর মাষ্টার মহাশয় না এলে কি পড়িতে নাই? এই আমি একখানা ভাল বই দিয়া যাচ্ছি, সেইখানা দুজনে পড়িতে পারিবে ত?"

অমৃত—"কি বই মা? সহজ ত?"

মা—"হাঁ খুব সোজা, আর ভাল ভাল গল্প ও উপদেশ আছে।"

সুরেন—"তা হলে দাও মা, এখনি দাও। আমি ভাল গল্প ও ভাল কথা শুনতে কি পড়তে বড় ভাল বাসি।"

মা তাঁর ঘর থেকে বইখানি আনিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে পড়িতে আরম্ভ করাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুটী ভাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া এক মনে বইখানি সমাপ্ত করিল। সুরেন তখন বলিল—"দেখ, দাদা! মা যদি না আস্তেন, তা হলে, আমরা কত কি বাজে কথাতেই আজ সকালবেলাটা কাটাতেম, আর এ কেমন চমৎকার কথা পড়িতে পেলাম! আমাদের মতন মা কিন্তু আর কারও নাই! ও বাড়ীর কেশব আর দুলাল সমস্ত দিনটা খেলা করিয়া বেড়ায়; কৈ, তাদের মা ত এমন ক'রে বই পড়তে দেন না? এবার অবধি আমাদের স্কুলের পড়া হয়ে গেলেই মার কাছ থেকে এক একখানা ভাল বই নিয়ে প'ড়ব, কেমন দাদা?" অমৃত ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে কথাগুলি শুনিল; তার পর বলিল "হাঁ ভাই! চল এখন স্নান করিগে, দেখ বেলা ১০টা বাজে।"—"তাই ত! ওঃ! এর মধ্যে এত বেলা হয়েছে? আমি তা কিছুই জান্‌তে পারি নাই। চল যাই।" উভয়ে পুস্তক খানি যত্ন করিয়া রাখিয়া স্নান ও আহারাদি করিতে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে বাহিরের বাড়ীতে

ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ঘোড়াটীকে দুজনে বড় ভালবাসে। অনেকক্ষণ ঘোড়াটীর গায়ে পায়ে, গলায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, আর নিকটে সইস্ ভাত বাঁধিতেছিল, তাহার মুখে ঘোড়ার কত কথা শুনিতে লাগিল; কত রকমের ঘোড়া আছে, কোন্ জাতের ঘোড়ার কি কি গুণ, কত দাম ইত্যাদি কত কথা। তার পর দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া ফুল বাগানের দিকে গেল। গোলাবাড়ী পার হইয়া বাগানের ছোট দরজাটীতে যেই পা দিয়েছে, অমনি দেখে যে একটা কি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেন কুড়াইয়া লইল। অবাক! এ ওর মুখপানে চাহিতে লাগিল; আর কাগজখানা দেখিতে লাগিল—একখানা পাঁচ টাকার নোট!

ফুলবাগানে যাওয়া আর হ'ল না। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে পরামর্শ করিতে লাগিল—কি করা যায়? "মার কাছে লইয়া যাইতে হইবে।—যার নোট হারাইয়াছে নিশ্চয়ই তিনি সন্ধান করিয়া তাহাকে দিবেন।" অমনি একছুট। অনেক অনুসন্ধান করা হইল, নোট যে কাহার তা কেহ বলিতে পারিল না। শেষে মা বলিলেন—"যখন কার নোট ঠিক হইল না, তখন ও তোমাদেরই হইল। তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার।" দুজনের আর আনন্দ ধরে না। নোট পাইয়া দুজনে পড়িবার ঘরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কিরূপে এই পাঁচটী টাকা খরচ করা হইবে। কতই বুদ্ধি আসিতে লাগিল, আবার তখনি "না সুবিধা হইবে না" "না, ওটা ভাল হয় না" মনে হইতে লাগিল। কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। অমৃতের ইচ্ছা, নিজেদের জন্য কোন পছন্দ মত ভাল জিনিস কিনে; সুরেন সে কথায় কাণ দেয় না, বরং বিরক্ত হয়—"কেন? আমাদের যা দরকার বাবাকে মাকে বলিলেই ত উচিত মনে করিলে তাঁহারাই কিনে দেন? সে জন্য এ টাকা খরচ করিতে হলে ত এক রকম বাবাকেই দেওয়া হয়। সে হবে না; এ টাকা কোন ভাল কাজে খরচ কর্ত্তে হবে।" তখন অমৃত বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, সকালে বৈখানিতে যে পড়িলাম 'কুড়াইয়া পাওয়া অর্থ নিজের দরকারে খরচ করিতে নাই, কেন না তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। যে যাহা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন না করে, তাহাতে তাহার যথার্থ অধিকার হয় না।' ঠিক কথা! এতক্ষণ আমার মনে ছিল না। এ টাকা ভাল কাজেই খরচ করিতে হইবে।" সুরেনের এ সব কিন্তু মনে ছিল, তাই সে এতক্ষণ ঐ কথা বলিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে স্থির হইল যে তাহাদের ক্লাশে গোপাল নামে যে ছেলেটী পড়ে তার বাপের পক্ষাঘাত রোগ হওয়া অবধি সে ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দেয়, কিন্তু বৈ শ্লেট কিনিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া পড়িবার বড়ই অসুবিধা হয়; ঐ টাকাতে তাহার সমস্ত বৈ ও একখানি শ্লেট, কিছু কাগজ, কলম ও কালি কিনিয়া দিতে হইবে। উভয়ের মন এখানে মিলিল। তখনি বাজারে গিয়া সমস্ত কিনিল, ও তা ছাড়া দুটী টাকা যে বাকী ছিল তাহাতে তাহার জন্য দুটী জামাও কিনিল।

"যাহা ভাল কাজ তাহা মনে উদিত হইবা মাত্রই করিয়া ফেলা উচিত" এই উপদেশ তাহারা মার মুখে প্রায় হাজার বার শুনিয়াছে; কাজেই তখনি সমস্ত সামগ্রী কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু তার পর এক বড় গোলে পড়িয়া গেল। গোপালদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছে। কিন্তু

কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল; বাড়ীতে যাইতে আর পারে না। গায়ে কাঁটা দিতেছে, বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিতেছে, আর সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন করিতেছে। একজন বৈ কখানি, আর একজন জামা ও শ্লেট কাগজ প্রভৃতি হাতে করিয়া তাহাদের পাঁচীলের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট কামড়াইতেছে, আর পথের দিকে চাহিতেছে। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; আর সে রাস্তাটা কিছু গলির মতন, তাই সেখান দিয়ে এখন একজনও লোক চলিতেছে না। নহিলে তাহারা সেখানে দাঁড়াইতে পারিত না। ছেলে মানুষ কি না? ভাল কাজ করিবে, উপকার করিবে—কেমন লজ্জা হইতেছে। হইতেই পারে।

এ অবস্থায় কিন্তু তাদের বেশীক্ষণ থাকিতে হয় নাই। গোপাল একটা বাটী হাতে করিয়া বাজারে যাইবার সময় বাহিরে আসিয়া দেখে যে দুটী ভাই পথের পাশে ঐরূপে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া সে আশ্চর্য্য বোধ করিল। এদিকে তাহারাও গোপালকে দেখিবামাত্র চম্‌কাইয়া উঠিল; বুকের ভিতর দুজনেরই যেন বড় বড় ঢেঁকি পড়িতে লাগিল "ধড়াস্ ধড়াস্"। তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল, গলা আট্‌কাইয়া গিয়াছে, কথা বাহির হইল না—সামগ্রীগুলি সমস্ত গোপালের সম্মুখে রাখিয়া দুজনে খুব শীঘ্র হন্ হন্ ক'রে চলে গেল; যাইবার সময়ে সুরেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কেবল বলিয়া গেল যে, "এ গুলি তোমার জন্য।" আহা! কি সুন্দর!!

ক্রমশঃ

নিদ্রালু ননীগোপাল।

আর দিন নাই এস ননী ভাই
পরশু পরীক্ষা হবে;
রজনী জাগিয়া বসিয়া বসিয়া
পড়ি মন দিয়া সবে।
এই কথা বলি ননীবপুতলি
ননীগোপালেরে ধরি;
বিমল সরল বালকের দল
বসাইল যত্ন করি।
পড়িতে বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া
ঘুমে হল ননী সারা;
মুখে পড়ে লাল ভাসে দুটী গাল
মুদিত নয়ন তারা।
পণ্ডিত মশায় ধরিয়া তাহায়
তুলে দেয় বারে বারে;
কেতাব খুলিয়া পড়ে গেঙ্গাইয়া
কিন্তু বুঝিবারে নারে।
পাঠে যেই জন নাহি দেয় মন
তার কি স্মরণে থাকে?
পড়ার বেলায় ঘুমে ধরে তায়,
মাঝে মাঝে নাক ডাকে।
হইল না পড়া ছাড়ি চূড়া ধড়া
হাতে লয়ে মোমবাতি;
চলে ননী ঘরে শুইবার তরে
না হইতে সন্ধ্যা রাতি।
ঘুমে আঁখি ভরা মুখটী হাঁ করা
ফেলি জুতা থালি পায়;
কাছা কোঁচা খোলা যেন ষোম ভোলা,
টলিতে টলিতে যায়।

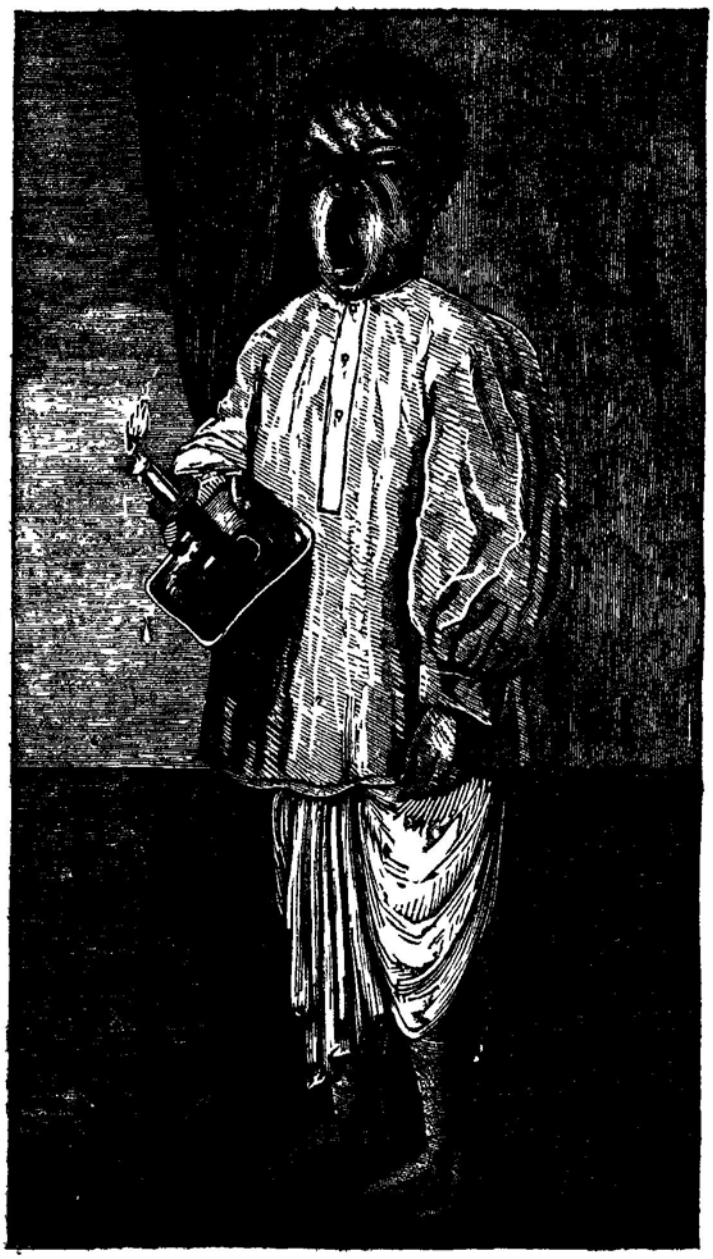

দেখো ভাই ননী খোকা ধনমণি
পড়িও না যেন ঢলে;

হাঁ করিতে আর হবে না তোমার!
যাও মার কাছে চলে।

অদ্ভুত কৌশল।

যদি সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ না থাকিত তাহা হইলে আমরা বাঁচিতাম না, আর কেবল তাহাই নহে এ পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোহর পদার্থ আছে, তাহার কিছুই থাকিত না, হয়ত এ জগতেরই সৃষ্টি হইত না। সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ আমাদিগের জীবন ধারণের যেমন এক প্রধান উপায় তেমনি সুখেরও এক প্রধান কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ এখন দিতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি এবং নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছি। আবার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত অবাক্ হইবে যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন তোমার বুড়ো ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদারও জন্ম হয় নাই, হয়ত যখন মানুষেরই জন্ম হয় নাই, তখন সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ দিয়াছে; সে আলোক এবং উত্তাপও তোমার নানা প্রকার সুখের জন্য সঞ্চয় হইয়া আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে পরমেশ্বর সেই আলোক ও উত্তাপ তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজ তাহারই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

পাথুরে কয়লা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইংরাজিতে ইহাকে 'কোল' বলে; আমাদের দেশে 'পাথুরে কয়লা' বলে। পাথরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা হয় তাহা নহে; বোধ হয় পাথরের মত কঠিন, পাথরের মত ওজনে ভারি এবং কতকটা পাথরের মত দেখ্‌তে এই জন্যই পাথুরে কয়লা বলে। বাস্তবিক ইহার পাথরের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই, আর শুধু 'কয়লা' বলিলে কাঠ পোড়াইলে যে কয়লা হয় তাহাই মনে হইতে পারে, এ জন্যও পাথুরে কয়লা বলা হয়। ইংরাজিতে দুইএরই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, পাথুরে কয়লাকে 'কোল্' বলে এবং কাঠের কয়লাকে 'চারকোল্' বলে।

অনেকের ধারণা আছে যে পাথর যেমন পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে, পাথুরে কয়লাও তেমনি পাথুরে কয়লার পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে। বাস্তবিক তাহা নহে। কয়লা খনি হইতে কাটিয়া আনিতে হয়। বিলাতে, আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে বড় বড় কয়লার খনি আছে। আমাদের দেশেও রাণিগঞ্জ, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে বড় বড় খনি আছে। মাটির অনেক নীচে এই সমস্ত কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন হাত মাটি খুঁড়িলেই যে কয়লার খনি বাহির হয় তাহা নহে। প্রথম স্তরে স্তরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তার পর বালির স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি খুঁড়িলে কর্দ্দমের স্তর বাহির হয়, তার পর অনেক সময় পাথরের স্তরও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলি খুঁড়িয়া ফেলিলে তখন কয়লার স্তর বাহির হয়। ইহার এক একটী স্তর অনেক দূর ব্যাপিয়া থাকে। আমেরিকার এক স্থানে সাত শত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ এবং একশত আশি মাইল প্রস্থ কয়লার খনি বাহির হইয়াছে; সমস্ত ইংলণ্ড ইহার অপেক্ষা ছোট। এখন ভাবিয়া দেখ এক একটী

কয়লার খনি কত বড়। এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতে কত লোক নিযুক্ত করিতে হয়, কত প্রকার বাষ্পীয় কল নিযুক্ত ও কত পরিশ্রম করিতে হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কি উপায়ে কয়লা সংগ্রহ হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা বলিব না; গত বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠা, সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। কয়লা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং আমাদের কি কি উপকারে আসে, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লার সঙ্গে পাথরের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এ জিনিসটা কি? যদি দুই কথায় ইহার উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে এই বলা যাইতে পারে যে পাথুরে কয়লা উদ্ভিদের রূপান্তর মাত্র। যে কাঠ পোড়াইলে কয়লা বা 'চারকোল্' হয়, এও সেই কাঠ; তবে ভিন্ন প্রকার অবস্থায় থাকাতে ভিন্ন আকার এবং ভিন্ন নাম হইয়াছে মাত্র। উদ্ভিদই যে কয়লার মূল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সময় গাছের পাতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ ও লতা পাওয়া গিয়াছে, যাহার আকার ঠিক রহিয়াছে, কিন্তু এখন আর পাতা অথবা লতা নাই; এখন সে গুলি কয়লা হইয়া গিয়াছে, অথচ আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা যে কয়লা দেখিতে পাই তাহাতে কোন চিহ্ন হয়ত থাকে না, কিন্তু খনি হইতে যখন প্রথম কয়লা সংগ্রহ করা হয়, তখন অনেক উদ্ভিদের চিহ্ন ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া নয়শত চৌত্রিশ রকমের উদ্ভিদ এ পর্য্যন্ত কয়লার মধ্যে পাইয়াছেন। কখন কখনও বড় বড় গাছও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এখন আর তাহা গাছ নাই, কয়লা হইয়া পড়িয়াছে। কি রকমে কয়লা তৈয়ার হয় তাহা এখন বলিতেছি। জলা স্থান, হ্রদ ও নদী প্রভৃতির মধ্যে প্রথম গাছের পাতা, ছোট গাছ, লতা এবং বড় বড় গাছ পড়িয়া জমিতে থাকে। জলে ঢাকা থাকে এজন্য বাতাসের সঙ্গে কোন সংস্রব থাকে না। ক্রমে এই গুলি পচিতে থাকে, এবং খানিকটা কাল হইয়া যায়, কিন্তু তখনও উদ্ভিদের আকার বজায় থাকে। ক্রমে বালি ও মাটির স্তর ইহার উপর জমিতে থাকে, এবং ক্রমে এই মাটির স্তর পুরু হইয়া উঠে। এই মাটির স্তরের চাপে ক্রমে ঐ জলমধ্যস্থ পদার্থগুলি জমাট বাঁধিতে থাকে, এবং ক্রমে রাসায়নিক যোগে রূপান্তরিত হইয়া কঠিন ও ভারি হয়; তখন ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা যায়। এক স্থানে যে একটী মাত্র স্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, ঐ প্রকার এক স্তর তৈয়ার হইলে উহার উপরে যে মাটির স্তর থাকে পুনরায় তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষাদি জমিতে থাকে, ক্রমে সে গুলি কয়লায় পরিণত হয়, এইরূপে অনেক স্তর হইতে দেখা যায়। ইহা যে দুই এক বছরেই হয় তাহা নহে; এক একটী স্তর তৈয়ার হইতে সহস্র সহস্র বৎসর দরকার হয়। এই কয়লার দ্বারা মানুষের যে কত উপকার হইতেছে, মানুষ যে কত সুখভোগ করিতেছে গণনা হয় না। এই কয়লার সাহায্যে আমরা বাড়ী আলোকে সাজাইতেছি, আমাদিগের খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করিতেছি। বড় বড় সহর ইহার সাহায্যে রাত্রিতে দিনের মত আলোকিত হইতেছে। ইহারই সাহায্যে রেল গাড়ীতে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাইতেছি। ইহারই সাহায্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কাপড় বোনা হইতেছে, লক্ষ রকমের কল চলিতেছে ও মানুষের নানা সুখ বিধান করিতেছে। আবার দেখ লক্ষ

লক্ষ লোক এই কয়লার খনিতে নিযুক্ত হইয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বোধ হয় তোমরা জান যে, যে কয়লা দ্বারা আমাদের রন্ধনের কাজ হয় তাহা ঠিক খনির কয়লা নহে। খনির কয়লা হইতে গ্যাস্ ও আল্‌কাত্‌রা বাহির করিয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের রন্ধন কাজে লাগে, এবং ইহাকে ইংরাজিতে 'কোক্' কহে। একটা হাঁড়ির মধ্যে এক খণ্ড আদৎ কয়লা রাখিয়া হাঁড়িটার মুখ আঁটিয়া, হাঁড়ির গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটা নল বসাইয়া যদি আগুনের উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে নলের মুখ হইতে ধূমের ন্যায় এক রকম জিনিস বাহির হইতেছে। ইহাকেই গ্যাস্ কহে, এবং জ্বালাইলে সুন্দর আলো হয়। গ্যাস ভিন্ন ইহা হইতে আগুনের উত্তাপে আল্‌কাত্‌রা বাহির হয়। এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে 'কোক্' কহে। পাঠক পাঠিকাগণ! যে কয়লার সাহায্যে তোমাদের গৃহ আলোকিত করিতেছ, সুমিষ্ট খাদ্য তৈয়ার করিতেছ, যাহার সাহায্যে বিদেশের বন্ধু বান্ধবদিগকে এক মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইতেছ, যাহার সাহায্যে এত সুখভোগ করিতেছ, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল এই কয়লার উত্তাপ ও আলোক দিবার শক্তি। এ উত্তাপ ও আলোক দিবার শক্তি কোথা হইতে আসিল? শুনিলে অবাক্ হইবে যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ দিয়াছে, এ সেই উত্তাপ এবং সেই আলোক। কাঠ পোড়াইলে যে উত্তাপ ও আলোক দেখা যায় তাহাও সেই সূর্য্যের উত্তাপ ও সূর্য্যের আলোক। বৃক্ষ সূর্য্যের যে উত্তাপ ও আলোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি যখন তাহাকে পোড়াইতেছ তখন সেই উত্তাপ ও আলোক তোমাকে দিতেছে। আর সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষেরা যে আলোক ও যে উত্তাপ সূর্য্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং পরমেশ্বর যে অদ্ভুত কৌশলে তাহা তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে সূর্য্যের সেই আলোক ও উত্তাপ ভোগ করিতেছ, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহা কি ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশল নহে?

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বালিকাগণ! আজ যে মহাত্মার ছবি অপর পৃষ্ঠায় দেখিতেছ উহাঁকে কি তোমরা চেন? নিশ্চয় চেন; যখন পাঁচ বৎসরের সময় তোমাদের বর্ণ পরিচয় হয়, তখন হইতে ইহাঁর সহিত পরিচয় হইয়াছে। ইনি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, বলিতে মনে কত সুখ হইতেছে। কেন না হইবে? এত বড় লোক যে দেশে জন্মে, এরূপ লোককে যাহারা আমাদের লোক বলিতে পারে তাহারা কেন না সুখী হইবে? বাস্তবিক ইনি যে আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন, এজন্য আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল।

আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় লোক তোমরা তাহার কিছুই জান না। তোমরা ছেলে মানুষ, কি করিয়াই বা জানিবে? যত বড় হইবে ততই ইহাঁর গুণাবলী শুনিবে। তোমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস প্রভৃতি

পড়িয়াছ, এই মাত্র জান; এবং হয়ত শুনিয়াছ যে ইনি এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই মাত্র জানাইলে ইহাঁর কিছুই বলা হইল না; ইহাঁর মহত্ত্ব কিছুই প্রকাশ করা হইল না। ইহাঁর ভিতরে যে মনুষ্যত্ব আছে, যে অসাধারণ মহত্ত্ব আছে, আমাদের ভাষার এমন কোন শব্দ নাই যে, তাহা দ্বারা আমরা তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলি। একটা দাঁড়ি পাল্লার এক দিকে যদি একটা মোণ চাপাইয়া দেও ও অন্য দিকে যদি একটা ছটাক চাপাইয়া দেও তাহা হইলে সে দাঁড়িপাল্লার যে দশা হয় আমাদের সহিত ইহাঁর তুলনা করিতে গেলেও সেই দশা ঘটে। আমাদের ১০০ জনকে এক পাল্লায় দিয়া ইহাঁকে আর দিকে দিলেও সমান হয় না। ইহাঁর জীবন-চরিত কিছু বলি শুন।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা

দ্বিপ্রহরের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি জেলার অধীন বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সহরে সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ শুনা যায় দশ টাকা মাত্র তাঁহার মাসিক আয় ছিল। এই সামান্য আয়ে তাঁহাকে বাড়ীর ব্যয় ও কলিকাতার নিজের ব্যয় চালাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স যখন ৮।৯ বৎসর তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আনিলেন। ১০৲ টাকা মাসিক আয়ে একে নিজের ব্যয় চলা দুষ্কর তাহাতে আবার পুত্রটীকে আনা হইল; ইহাতে পিতা ও পুত্র উভয়কে কিরূপ ক্লেশে দিন কাটাইতে হইত, তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার। সেই নবম বর্ষীয় বালক স্নেহময়ী মাতার কোল ছাড়া হইয়া আসিয়া কলিকাতায় ঘোর দারিদ্র্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া থাকেন, সে সময়ে তিনি তরকারির মুখ প্রায় দেখিতে পাইতেন না; প্রায় ভাতে ভাত ও কখন কখনও লবণ দিয়া ভাত খাইয়া থাকিতে হইত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আনিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই বালকের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাস্তবিক জগদীশ্বর তাঁহাকে আশ্চর্য্য মানসিক তেজ ও প্রতিভা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন; তিনি যে শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন, সেই শ্রেণীতেই বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার বালককাল হইতেই লোকে বুঝিতে পারিল যে এ ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে একটা অদ্বিতীয় লোক হইবে।

যাহা হউক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি কালেজের পাঠ সমাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইয়া বাহির হইলেন। সেই সময়ে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ নামে একটী কালেজ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ৫০৲ টাকা বেতনে সেই কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ পাইলেন। এই খানে কর্ম্ম করিবার সময় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ বৎসরের এপ্রেল মাসে তিনি সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে আবার কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে কর্ম্ম করিয়া পুনবায় সংস্কৃত কালেজে আসিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের কাজ করিবার সময় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। এদেশের বালিকাদিগের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়, অনেক বালিকা শৈশবেই বিধবা হয়; তাহাতে আবার কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে সে আর বিবাহ করিতে পায় না। তাহাকে চিরজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। পরের গলগ্রহ হইয়া, লোকের তাড়া খাইয়া, দশজনের গঞ্জনা সহিয়া বিধবাদিগকে যেরূপে দিন যাপন করিতে হয় তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ে দয়া হয়? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের দুঃখ দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ কিনা, এইরূপ বিবাহ দেশে প্রচলিত

করা উচিত কিনা এই চিন্তাতে রত হইয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। দেশের হাজার হাজার লোক প্রতিদিন স্বচক্ষে বিধবাদিগের কত যাতনা দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা দেখিয়া উপেক্ষা করে; বিদ্যাসাগর মহাশয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই তাঁহার মহত্ত্ব। দুঃখিনী বিধবাদের জন্য কি করি?—এই চিন্তাতে তাঁহার মনের শান্তি গেল। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। তিনি দিন দিন এই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক রাশির মধ্যে নিমগ্ন; মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীর রূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একবার এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিবার জন্য বাহিরে যাইতেন, তদ্ভিন্ন সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। এখন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাশীকৃত হাতে লেখা পুথী পড়িয়া তাঁহাকে এক একটী বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম ও পাঠের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তিনি শাস্ত্রের বচন তুলিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন আন্দোলন প্রায় দেখা যায় না। চারিদিকে হুলস্থুল। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এই চর্চ্চা। পথ ভিখারিগণ বিধবা বিবাহের গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই গান পেড়ে বুনিয়া ধুতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। ওদিকে দেশের প্রাচীন কালের কুসংস্কার যাহাদের মনে প্রবল ছিল তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা বলিয়া কত কটূক্তি করিতে লাগিল। ঠিক যেন বোধ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ একটা কোন দ্বার খুলিয়া দেশ মধ্যে এক প্রকাণ্ড ঝড় আনিয়া ফেলিলেন। এই ঝড়ে সকলে কাঁপিয়া গেল; যে তাঁহার বন্ধু ছিল সে গা ঢাকা দিল; যে সহায় ছিল সে দূরে পলাইল; যাহারা বিধবা বিবাহের সপক্ষ বলিয়া নাম দিয়াছিল তাহাদের অনেকে গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহাকে একঘরে করিবার জন্য সমাজের লোক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল। কিন্তু এত যে ওলট পালট হইয়া গেল, ইহার মধ্যে এক জন লোক কেবল কাঁপিলেন না; একটু নুইলেন না; একবার দমিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগর। তাঁহার মুখে একটু ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। যে দিন কলিকাতা সুকীয়া-ষ্ট্রীটে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তখন আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ওঃ সে দিনের কি ব্যাপার! দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই হাত অন্তর পাহারা রাখিতে হইয়াছিল; নতুবা দুষ্ট লোকে বোধ হয় তাঁহাকে ও বরযাত্রীদিগকে মারিয়া ফেলিত। অন্য লোক মুখে বলে, কাজে করে না; বিদ্যা-

সাগর মহাশয়ের যে কথা সেই কাজ। তিনি বীরের ন্যায় স্বকর্ত্তব্য সাধনের জন্য দাঁড়াইলেন, দেশ শুদ্ধ লোকের ভ্রূকুটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করিলেন না। দেশের পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রথম প্রচারিত গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছিলেন; তিনি তাহার উত্তর দিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বিচারশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। অদ্যাবধি কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারে নাই।

তোমাদিগকে বলি শুন, এমন বীর পুরুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যে প্রতিজ্ঞার বলে বাল্যকালের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার বলে দেশ শুদ্ধ লোকের শত্রুতার উপরে জয় লাভ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপায় করিলেন, উপক্রমণিকা ও কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ পাইলেন। উভয় কার্য্যের বেতন একত্র করিয়া তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইল। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টাতে উক্ত কয়েকটী জেলার পল্লীগ্রামে অনেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। এক দিকে তিনি যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন, আর এক দিকে বালকদিগের সুপাঠ্য গ্রন্থ সকল রচনা করিতে লাগিলেন। বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি প্রচারিত হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকরী তাঁহার অনেক দিন পোষাইল না। তিনি ঘোর দারিদ্র্য ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দরিদ্র হইলে লোকের যে নীচতা হয় সে নীচতা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি কখনও আত্ম-মর্য্যাদা ভুলেন নাই; কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারণ করাত শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি; আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাঁহার অপেক্ষা ঐ দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড় লোক নহেন। যে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সাহসী সেই মানবকুলে রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

যাহা হউক কে কোথায় দেখিয়াছ এক জন গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে একটী ৫০০৲ শত টাকার চাকরী পাইয়া এক কথায় তাহা ছাড়িতে পারে? কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের মনে অর্থের লোভ থাকে না। ধন সম্পদের প্রতি এ সব মহাত্মার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। যে মনুষ্যত্বের অগ্নি ইহাঁদের মনে নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, তাহার নিকট ধনসম্পদ তৃণ অপেক্ষাও হীন। ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন না। তিনি তাঁহার প্রতি কিছু অপমান সূচক ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের তেজস্বী অন্তরে সেই ব্যবহার শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ৫০০৲ শত টাকাকে পাঁচ শত খোলার কুচির ন্যায় জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। সাংসারিক লোকে কত ভয় দেখাইল, খাবে কি? পরিবে কি? চলিবে

কিরূপে? বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিন্তু দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রন্থ রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় পরিশ্রমে এমন আয় দাঁড় করাইয়াছেন যে মাসে ৫০০৲ শত টাকা দিয়া এক জন লোক নিজের চাকর রাখিতে পারেন। যে মহাশয়েরা বলিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর না খাইয়া মরিবে তাঁহারা এখন কোথায়? জগদীশ্বর কি বস্তু দিয়া এই ব্যক্তিকে গড়িয়াছেন, সংসারের স্বার্থপর নীচ প্রকৃতির লোকে বুঝিবে কি?

বিদ্যাসাগরের আত্ম নির্ভরের আর একটী গল্প বলি শুন, বিধবাদিগের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার অনেক হাজার টাকা ঋণ হয়। একবার সহরের কতকগুলি ভদ্র লোক তাঁহার ঋণ শোধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে এরূপ অনেক লোকে টাকা দিতে যাইতেছে যাহারা বিধবা বিবাহের জন্য দিতেছে না কিন্তু কেবল বন্ধুকে বিপমুক্ত করিবার জন্যই দিতেছে। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পত্রে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন যে "বিধবা বিবাহের জন্য যিনি যাহা দিবেন তাহা তিনি কৃতজ্ঞ অন্তরে লইবেন। কিন্তু তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অন্যের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।" এরূপ তেজী পুরুষ যদি পরের কৃপার মুখাপেক্ষা করিবেন তবে মনুষ্য নামের গৌরব থাকিবে কেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপরাপর কীর্ত্তি পরোপকার, দয়া, আত্ম-মর্য্যাদা বিষয়ে এত বলিবার আছে যে তাহা সমুদায় বলিতে গেলে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। তাহার কিছু কিছু আর এক বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পূজার ছুটির আমোদ।

বিদেশী পাঠক অনেকেই পূজার ছুটিতে বাড়ী চলিলেন। এই ছুটিতে অনেকেই অনেক প্রকারের আমোদ করিবেন। নূতন রকমের আমোদ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। একখানি ইংরাজি বই পড়িয়া যে সব নূতন আমোদের কথা এবারে শিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে লিখিতেছি, একবার নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঘরের মাঝামাঝি একটা পর্দ্দা টাঙাইয়া তাহার একপাশে আলো রাখিয়া তাহাতে আপনারা থাকিবেন। অপর পার্শ্ব অন্ধকার করিয়া তাহাতে কতকগুলি দর্শক ডাকিয়া বসাইবেন। এখন আপনারা আলো এবং পর্দ্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিবেন, পর্দ্দায় তাহার যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে তার চেয়ে ঐ সকল অঙ্গ ভঙ্গী আরো সুন্দর দেখাইবে।

খুব সরু সুতার দ্বারা একটা পুতুল টাঙাইয়া তাহার পেছনে যতগুলি আলো ধরা যায়, পর্দ্দায় ঐ পুতুলের ততগুলি ছায়া আসিয়া পড়িবে। এখন এক একটী আলোকে ইচ্ছামত নাচাইতে থাকুন, পর্দ্দার ছবিও ঐরূপ নাচিবে। দুই তিনজন লোক হইলে ইহাতে বেশ আমোদ পাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকে যদি দু হাতে দুটা আলো ধরিতে পারেন তাহা হইলেই উত্তম হয়।

আলোটা একটা টেবিলের উপরে রাখিয়া তাহার সামনে হাত ধরিলে পর্দ্দায় ঐ হাতের ছায়া পড়িবে। এখন বুদ্ধি খাটাইতে পারিলে হাতটীকে কি হাত দুটীকে এরূপ ভাবে রাখা যাইতে

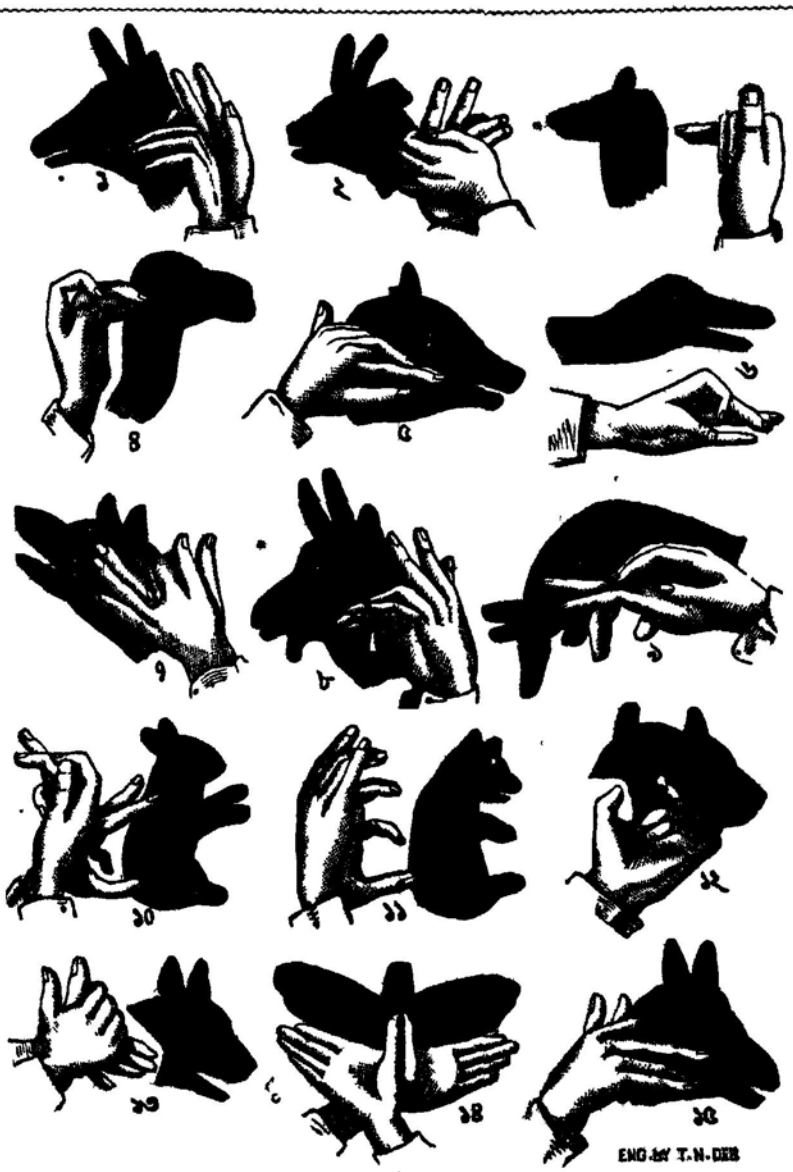

পারে যে, পর্দ্দায় যে ছায়াটা পড়িবে, তাহাকে একটা না একটা জানোয়ারের মতন দেখাইবে। হাত কিরূপ ভাবে রাখিলে কোন্ জানোয়ার হইবে,তাহা মুখে বলা তত সহজ নহে। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি একবার ছবি গুলির দিকে তাকান, তাহা হইলে আমার লেখার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। জানোয়ার গুলি অবিকল হইল না। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই দর্শকেরা বেশ্ সন্তুষ্ট হইবেন।

স্থানাভাবে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা এবারে দেওয়া গেল না।

নবেম্বার, ১৮৮৫।

স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ।

একবার ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত কোন এক যুদ্ধে জনৈক ইংরাজ নাবিক ফরাসীদিগের নিকটে বন্দী হয়। যে একদিনও সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া বিষণ্ণ হয় নাই, সে স্বাধীনতা-সুখ হারাইয়া পরের নিকট বন্দী হইল। গভীর যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যদিও সে নিয়মমত খাইতে পরিতে পাইত; তবু বন্দী। আমরা স্ব ইচ্ছায় একটী নির্জ্জন গৃহে এক বৎসরও থাকিতে পারি, কিন্তু কেহ আমাদিগকে বাধ্য করিলে, আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে, আমরা আর ঐ প্রকারে থাকিতে পারি না; মন যেন সদা সর্ব্বদা ছটফট করিতে থাকে, কিছুতেই যেন আমাদের কষ্ট দূর হয় না। এই জন্যই উক্ত নাবিকের মুখ-মণ্ডল বিষণ্ণ। দিনের পর দিন চলিয়া গেল; মুখে হাসি আর কেহ দেখিল না, স্বাধীনতা সুখ সে অনেক দিন হইতে হারাইয়াছে। এই প্রকারে কতিপয় দিবস অতীত হইল। অবশেষে ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে ঐ নাবিক মুক্ত হইল। তাহার এক্ষণ আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। ইংলণ্ডে যাইতেছে এমন সময় পথিমধ্যে একজন ব্যাধের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সে কতকগুলি পাখী বিক্রয় করিবার জন্য একটী পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; দেখিয়া তাহার মনে ভয়ানক ক্লেশ হইল। দুই দিন পূর্ব্বে নিজের জীবনের দশা একবার ভাবিল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে আর ঐ পাখীগুলির এই দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ খাঁচা সহ পাখীগুলিকে ক্রয় করিয়া, খাঁচার মুখ খুলিয়া একটী একটী করিয়া পাখীগুলিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল। পাখী-বিক্রেতা নাবিকের এই প্রকার অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার তিরস্কার শুনে কে? স্বাধীনতা প্রিয় ইংরাজ আনন্দিত চিত্তে সমস্ত পাখীগুলিকে ছাড়িয়া দিলে, তাঁহারা মুক্ত হইয়া আকাশে উঠিতে উঠিতে যেন তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। (পর পৃষ্ঠায় ছবি দেখ)

তাহার পর নাবিক ব্যাধকে বলিল "যদি তুমি কখন আমি যতদিন কারাগারে ছিলাম ততদিন কারাগারে থাকিতে, তাহা হইলে স্বাধীনতা হারাইলে যে কি দুঃখ হয় তাহা অনুভব করিতে পারিতে; এবং আমি এই সুন্দর পাখীগুলিকে যে ছাড়িয়া দিতেছি, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে না। এই

ARTIST' PRESS.

পাখীগুলির স্বাধীনতা তুমি হরণ করিয়াছ। ইহাদের যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা যে একবার স্বাধীনতা হারাইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। যাঁহারা স্বাধীনতা প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তাঁহারা সকলেই অপরকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিতে ইচ্ছা করেন।"

ব্যাধ এই কথাগুলি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। বিদ্যুতের ন্যায় এই কথা গুলি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিল। "এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের পয়সা দিয়া পক্ষীর স্বাধীনতা দান করে" এই কেবল ভাবিতে লাগিল। এবং এই এক কথা শুনিয়া তাহার জীবনের গতি বদলাইয়া গেল।

আমাদের ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়তঃ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গদিগকে ধরিয়া অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট দেন এবং তাহাদের যাতনা দেখিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং

ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীনতা হারাইলে পশু পক্ষীরাও ঠিক আমাদের মত কষ্ট পায়।

ছেলে-খেলা।

ছোট ছোট ছেলেগুলি দেখিতে সুন্দর।
আলো করে থাকে যেন গৃহস্থের ঘর॥
ফুটন্ত ফুলের মত ফুলের বাগানে।
হাসিছে খেলিছে সদা প্রসন্ন বয়ানে॥
সুকুমার তনুখানি কেমন নির্ম্মল।
চাঁদমুখে চক্ষু দুটী করে ঢল ঢল॥
তরল চপল অতি জীবনের গতি।
কিন্তু খেলিবার কালে বড় স্থির মতি॥
ডাকিলে না দেয় সাড়া খেলায় পাগল।
খেলা ছাড়ি থাকিতে না পারে এক পল॥
দিনমানে তিল মাত্র নাহি অবসর।
নিরলসে নানা খেলা খেলে নিরন্তর॥
কি কাজ করিব বলি ভাবে না কখন।
করে নিত্য নব নব খেলার সৃজন॥
কভু ঘোড়া হয়ে পিঠে চড়ায় অপরে।
কখন আপনি চাপে অন্যের উপরে॥
কখন পুকুর খোঁড়ে বাঁধে পথ ঘাট।
কখন ঠাকুর গড়ি পড়ে পূজা পাঠ॥
ছেলের কল্যাণে প্রতি গৃহস্থের ঘরে।
বার মাসে তের পর্ব্ব দেখে সব নরে॥
কিন্তু ভাই কর খেলা তাহে ক্ষতি নাই।
মাঝে মাঝে কিছু কিছু পড়া শুনা চাই॥
তোমাদের সঙ্গে চাহে খেলিবারে কবি।
পড়িয়া সখার পদ্য, দেখি তার ছবি॥
এ বড় মজার খেলা নূতন প্রকার।
আমোদের সঙ্গে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥
তার সঙ্গে নীতি শিক্ষা আপনা আপনি।
মাই খেয়ে বাড়ে যথা খোকা যাদুমণি॥ *

মাইকেল ফ্যারাডে।

অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কত বড় হইতে পারে, চেষ্টা ও যত্নদ্বারা, সহায়হীন দরিদ্র সন্তান, নিজ অবস্থার কতদূর উন্নতি করিতে পারে, ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করিলে, তাহা বেশ বুঝা যায়। অতি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, অধ্যবসায়ের গুণে ফ্যারাডে জগতে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইংলণ্ডে তিনি সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। তিনি স্কুল বা কালেজে নিয়ম মত লেখা পড়া শিখেন নাই, তাঁহার ধন সম্পত্তিও ছিল না কেবল নিজ চেষ্টা ও যত্নে তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর এই মহাত্মার জন্ম হয়। লণ্ডন নগরের কোন একটী পল্লিতে

* গত সংখ্যায় সচিত্র পদ্য দেখ।

এক আস্তাবলের উপরে কয়েকটী ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহার পিতা থাকিতেন, এবং সামান্য কর্ম্মকারের কাজ করিয়া কোন মতে সংসার চালাইতেন। এই দুর্দ্দশার মধ্যে যখন ফ্যারাডের জন্ম হয় তখন কে ভাবিয়াছিল যে, এক সময়ে তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইবেন? ফ্যারাডের পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামান্য কর্ম্মকারের কার্য্য করিতে হইত, সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহারা ধনী ছিলেন। ফ্যারাডের পিতা মাতা অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ফ্যারাডে এই ধর্ম্মভাব পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহারা সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারেন নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে উত্তমরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ফ্যারাডে ক্রমে বড় হইলেন। পিতার সামান্য উপার্জ্জনে ব্যয় কুলান না দেখিয়া

এগারো বৎসরের বালক ফ্যারাডে এক পুস্তক বিক্রেতার দোকানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ সংবাদ পত্র বিলি করা তাঁহার সেই সময়ে প্রধান কাজ ছিল। শুনা যায় ফ্যারাডে তখন একটুও লেখা পড়া জানিতেন না, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। সংবাদ পত্র বিলি করিবার জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি ঐ সংবাদ পত্রের সাহায্যে অক্ষর চিনিলেন, এবং অধ্যবসায়ের গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই পড়িতে শিখিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার এইরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজ কার্য্যে অবহেলা করিতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতা গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ পুস্তক বিক্রেতার দোকানে যে কেবল পুস্তক বিক্রয় হইত তাহা নহে, পুস্তক বাঁধান কার্য্যও হইত। ফ্যারাডে এখন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বলিতে গেলে এই দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই ফ্যারাডের উন্নতির পথ খুলিয়া গেল। তাঁহার যে সমস্ত পুস্তক বাঁধিতে হইত, তাহার মধ্যে কয়েকখানি বিজ্ঞানের পুস্তক ছিল; বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্বভাবতই তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের পুস্তক দেখিয়া ফ্যারাডের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অবসর সময়ে, এবং কখন কখন কাজ করিতে করিতেও একাগ্র হইয়া এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়াই লোকে বড় লোক হয়, এইরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণেই লোকের উন্নতি হয়। এইরূপে কয়েকখানি বই পড়িয়া ফ্যারাডের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি কেবল বই পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা হইত তাহাতে নিয়ম মত তিনি উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একাগ্র চিত্তে সেই সমস্ত বক্তৃতা শুনিতেন, এবং তাহার সারাংশ লিখিয়া আনিতেন। এই সমস্ত এত সুন্দর হইত যে ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞানবিৎ সার হাম্‌ফ্রে ডেভি তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্যারাডে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, কোন মতে তাঁহাদের দিনপাত হইত। একদিন ফ্যারাডের ইচ্ছা হইল যে তিনি একটী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু তাহাতে অনেক টাকার দরকার! ফ্যারাডে সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না, তিনি কষ্ট করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কয়েকটী সামান্য সামান্য জিনিস কিনিয়া একটী কল তৈয়ার করিলেন। বালকের বুদ্ধি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। ঐ দিন এক ব্যক্তি কার্য্য উপলক্ষে ঐ দোকানে আসেন, তিনি বালকের এই প্রকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং বিজ্ঞান শিখিবার জন্য এরূপ আগ্রহ দেখিয়া 'রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন্' নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। ফ্যারাডের উন্নতির পথ ক্রমে পরিষ্কার হইতে লাগিল। তাঁহার প্রভু তাহাকে এই বিজ্ঞান চর্চ্চায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ফ্যারাডে বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার মনে এক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পুস্তক বাঁধা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। ফ্যারাডের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য দপ্তরীর কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন ইহা কখনও সম্ভব নহে। ফ্যারাডে কোন পথে যাইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার

জীবনের প্রধান কার্য্য, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডে তখন অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার পথেও বিঘ্ন অনেক। ফ্যারাডে দরিদ্র দপ্তরী, কোন মতে দিন কাটিয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় এই সামান্য সম্বলটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যদি তিনি বিজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসার চলিবে কি প্রকারে? আর তিনি সহায় সম্বল শূন্য; কেইবা তাঁহাকে সেরূপ সুযোগ করিয়া দিবে? কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। ফ্যারাডে অনেক চিন্তার পর এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি যে সমস্ত বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিতেন, তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইগুলি সমস্ত একত্র করিয়া তিনি পুস্তকাকারে লিখিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি আবশ্যকীয় চিত্র ও ইহাতে তিনি নিজে চিত্রিত করিলেন। তার পর সার হাম্‌ফ্রে ডেভির নিকট ঐ পুস্তকখানি এবং তাহার সহিত একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রখানিতে নিজের মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহা ইহাতে লিখিলেন, এবং তাঁহার সেই সময়ের যে অবস্থা তাহাও লিখিয়া দিলেন। ডেভি সেই পুস্তকখানি পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ফ্যারাডের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন; এবং তাঁহার পত্রখানিতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছাও বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইল;—তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে, উইলিয়ম পেইনের স্থানে, ডেভির সহকারী নিযুক্ত হইলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল পরিষ্কার রাখা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করা ফ্যারাডের প্রধান কার্য্য ছিল। এবং ইহাতে তাঁহার নিজ উন্নতির অনেক সুবিধা হইয়াছিল। অবসর পাইলেই এই সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি নানা প্রকার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতেন, এবং নূতন নূতন পরীক্ষার দ্বারা নিত্য জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতেন। এই যুবকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, এ যুবক সামান্য নহে, একদিন ইংলণ্ডে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি অদ্বিতীয় হইবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভি বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন, ফ্যারাডেও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত হন। সকলেই তাঁহার গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উন্নতির চরম-সীমা প্রাপ্ত হন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সর্ব্ব প্রধান পদলাভ করেন; এবং সেই বৎসরেই কোন ধর্ম্মপ্রচারকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে ফ্যারাডে নিয়মিত রূপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন; গণ্য, মান্য, ধনী, বিদ্বান, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। তাঁহার প্রধান গুণ এই ছিল যে, অতি গুরুতর বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, এমন কি বালকেরা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পারিত।

এক দিন বক্তৃতা-গৃহ হইতে বক্তৃতা করিয়া

আসিবার সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে একটী জিনিস মেজেতে পড়িয়া যায়। সমস্ত ঘর তখন অন্ধকার। জিনিসটী পড়িবা মাত্রই ফ্যারাডে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার একটী শিষ্য বলিল "আজ অন্ধকারে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক কি? কল্য উহা পাওয়া যাইবে।" ফ্যারাডে হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি যাহা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি তাহা কখনই অসম্পূর্ণ রাখি না; অদ্য ইহা না করিলে আমার জীবনে যাহা কোন দিন ঘটে নাই তাহাই হইবে।" বহু কষ্টের পর জিনিসটী প্রাপ্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এইরূপ যাঁহার প্রত্যেক সামান্য কাজের জন্যও অদম্য অধ্যবসায় তিনি যে অদ্বিতীয় হইবেন তাহাতে আর কি কোন সন্দেহ আছে?

কিন্তু ফ্যারাডে কেবল বিজ্ঞানের বক্তৃতায় যে নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে। পিতা মাতার নিকট হইতে বাল্যকালে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। যাঁহারা মনে করেন বিজ্ঞান শিখিলে নাস্তিক হইয়া যায়, তাঁহারা ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করুন। দেখিবেন গভীর বিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন ধর্ম্মভাব একত্রে রহিয়াছে। মানুষের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক ফ্যারাডের তাহা সমস্তই ছিল। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল, তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন, সকল সময়েই তাঁহার মন প্রফুল্ল। ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে থাকিলে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত, তেমনি অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভও হইত। তিনি যাহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই চিরজীবন নিযুক্ত ছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানের আলোচনা, অন্যদিকে ধর্ম্ম প্রচার; জীবনে একদিনও তিনি ইহা ভুলেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন্ পান, এবং তাঁহাকে উপাধি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফ্যারাডে জানিতেন যে, এ পৃথিবীর মান, সম্ভ্রম, উপাধি এ সমস্ত কিছুই নহে, এই জন্য তিনি উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বাস্তবিক যে ব্যক্তি বড, উপাধিতে তাঁহাকে আর বড করিতে পারে না। কেবলমাত্র মাইকেল ফ্যারাডে বলিলে সমস্ত পৃথিবীর লোক যাঁহাকে চিনিতে পারে, তাঁহার আর উপাধির আবশ্যক কি?

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫ আগষ্ট ৭৬ ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময়ে ফ্যারাডের মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার মৃত্যুতে ইংলণ্ড এক প্রধান রত্ন হারাইয়াছে।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

(পিতা মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।)

আমরা এই পৃথিবীতে যে মুহূর্ত্তে পদার্পণ করিয়াছি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের পিতা মাতার আর বিশ্রাম নাই। সেই দিন হইতে আমাদের যদি কোন একটা সামান্য বিপদ হয় তাহা হইলেই তাঁহারা একেবারে

* এ বৎসর যাঁহারা রচনায় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম সেপ্টেম্বর মাসের সখায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সমুদায় রচনাগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র একটী রচনা প্রকাশিত হইল। স-সং।

ভাবিয়া আকুল হন। শৈশবকাল হইতে যদি তাঁহাদের যত্নে প্রতিপালিত না হইতাম তাহা হইলে আজ আর আমরা সংসারে দাঁড়াইবারও একটা স্থান পাইতাম না। আমরা এ সংসার অরণ্যের নূতন পথিক, আমরা ইহার কণ্টক বৃক্ষকে গোলাপ বৃক্ষ বলিয়া ধরিতে যাই, চোরা বালিকে শক্ত মাটি ভাবিয়া তাহারই উপর পা দিয়া দাঁড়াইতে যাই, বিপদকে আমরা সম্পদ মনে করি। যদি আমাদের পিতা মাতারা আমাদের প্রতি পদে পদে সতর্ক করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের কি দশা হইত? যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতারা আমাদের সৎশিক্ষা না দেন, সদুপদেশ না দেন, তাহা হইলে বড় হইয়া কি আমরা কখন সুখ-ভোগ করিতে পারি? যে ব্যক্তি ক্রোধ হিংসা বা অন্য কোন রিপুর পরবশ সে যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার নিকট রিপু দমন করিতে শিক্ষা না করে, তাহা হইলে সে কোন কালেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। * * * * মাতার ন্যায় আমাদিগকে কে অত ভালবাসিতে পারে? কাঁহার হৃদয়ে অত স্নেহ? খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া আসিয়া "মা" "মা" করিয়া যখন আমরা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি, তখন আমাদের হৃদয় কিরূপ সুখে কিরূপ আনন্দে উথলিত হইয়া উঠে? দুঃখে, কষ্টে, ভয়ে, বিপদে মাতার মত অটল আশ্রয় আর কোথায় পাইব? কে আর অমন নির্ম্মল শান্তি আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিবে? মাতার যে স্নেহ যে ভালবাসা তাহা অখণ্ড, অতুলনীয়, স্বর্গীয়। ইহা দেবের দুর্লভ। বন্ধুর প্রেমে স্বার্থপরতা আছে, * * * * * কেবল পিতা মাতার প্রেমের ন্যায় নিরভিমান নিঃস্বার্থ প্রেম আর কোথাও নাই।

পিতাই বা আমাদের জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করেন? দিন নাই, রাত্রি নাই তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কতই না পরিশ্রম করিতেছেন। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য আপনার জীবন যেন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মুখে একটী হাসি ফুটাইবার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটী কাঁটা সরাইবার জন্য তিনি যে কতদূর সহ্য করেন তাহা আমাদের বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। পিতা মাতা বিপদ দেখিয়া পিছু-পা হন না, সন্তানকে অযোগ্য বা অকৃতজ্ঞ দেখিয়াও তাঁহাদের ভালবাসা হ্রাস পায় না। ইহাঁরা সন্তানের সুখের নিমিত্ত সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারেন, সকল স্বার্থই ত্যাগ করিতে পারেন। সন্তানের গৌরবে তাঁহারা নিজে গৌরবান্বিত হয়েন, এবং সন্তান সম্পদ ভোগ করিলে, তাঁহাদের মনে হয় যেন তাঁহারা নিজেই সুখ ভোগ করিতেছেন। যদি তাহার নামে কোন বিশেষ অপবাদ হয় তথাপিও তাঁহারা তাহাকে সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই ভাল বাসেন। সমস্ত জগৎ যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে তাঁহারাই তাহার সমস্ত জগৎ হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন।

আমরা পিতা মাতার ভালবাসা হইতে ঈশ্বরের স্নেহ ধারণা করি ও তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি। * * * * * পিতা মাতার ঋণ আজীবন ধরিয়া শুধিলেও শোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এ ঋণ পরিশোধ করিতে কি আমরা চেষ্টা করিব না?

ছেলেবেলায় কিছু আমাদের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় নহে, তখন আমাদের ঋণ করিবার কাল। আমাদের ছেলেবেলার কর্ত্তব্য পিতা

মাতার কথা শুনা। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বুঝেন; তাঁহারা যাহা করেন সকলই আমাদের ভালর জন্য। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে আমার হয়ত কোন একটা কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু পিতামাতারা অনুমতি দিলেন না। তখন সহজেই ক্ষুণ্ণ হই। কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝিতে পারি যে সেই কার্য্য করিলে আমার অমঙ্গল হইত। এইরূপ পিতামাতারা যখন তিরস্কার করেন আমরা অনেক সময় রাগ করি, কিন্তু আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা যে তিরস্কার করেন সে আমাদেরই ভালর জন্য। আমরা একটা মন্দ কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে আর না করি সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই তাঁহারা আমাদের ভৎর্সনা করেন। তাই বলি বাল্যকালে আমরা অজ্ঞান, সেই জন্য পিতামাতাকে পথপ্রদর্শক করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলা উচিত, তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা উচিত, তাঁহাদিগকে ভক্তি মিশ্রিত ভয় করা উচিত। তাহার পর আমরা যখন বড় হইব, সাংসারিক কার্য্যের ভার যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে যখন পিতামাতারা বৃদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহাদের সহিত আমাদের আর এক সম্পর্ক হইবে, তখন আমরা তাঁহাদের পিতা মাতা হইব, তাঁহারা আমাদের সন্তান হইবেন। পূর্ব্বে তাঁহারাই আমাদিগকে যেরূপ যত্নে লালন পালন করিতেন, এ সময় আমরা যদি সেইরূপ যত্নের সহিত তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারি, আমরা যদি তাঁহাদের সহায় সম্বল হইয়া ধর্ম্মপথে মন রাখিয়া আপনাদের ব্যবহারে তাঁহাদের সুখী করিতে পারি, তাঁহাদের সুখের জন্য আপনাদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি তবেই আমাদের জীবন সফল হয়, জীবন পবিত্র হয়। আমাদের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের সাধ্য নহে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করা হয়।

শ্রীসরলা দেবী,
বয়স ১২ বৎসর ১১ মাস।

দুই ভাই।

(শেষাংশ।)

এইরূপে দুটী ভাই দ্রব্যগুলি দিয়া চলিয়া গেলে গোপালের মন যে কিরূপ হইল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতেই পারিতেছ। সে ভাব প্রকাশ করা যায় না। এক এক খানি করিয়া দেখিল যে, তাহার আবশ্যকীয় সকল পুস্তকই আছে। নিতান্ত দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া জামাদুটী দেখিয়া খুব আহ্লাদ হইল বটে, কিন্তু পড়ার কষ্ট যে দূর হইল এ আনন্দ আর তাহার ধরে না। পিতার রোগ হওয়া অবধি সংসারের কত যে কষ্ট তাহা নিজে দেখিতেছে; মা মনের দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনে অনেক দিন অবধি ইচ্ছা হইয়াছে যে, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে এবং শীঘ্র শীঘ্র

কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার কষ্ট দূর করিবে। এই ইচ্ছা হওয়ায় ভদ্রলোকদের নিকট স্বয়ং যাইয়া ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দিত, এবং পাড়ার একটী ছেলের বাড়ীতে গিয়া তাহার বৈ দেখিয়া পড়িয়া আসিত। তাহার পড়াশুনার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন এবং সাহায্য করিতেন। এক্ষণে বৈগুলি পাইয়া বাড়ী বসিয়া পড়া হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে পড়িতে যদি আবশ্যক হয় পিতার সেবাও করিতে পারিবে, এই আশা মনে হইল ও আনন্দে তাহার মন একেবারে পূর্ণ হইল। সে বৈ, শ্লেট, কাগজ, কলম, জামা ও অন্য সমস্ত দ্রব্যগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতর মাকে বাবাকে দেখাইতে লাগিল। দুটী ভাইএর দয়া ও সৎইচ্ছার বিষয় শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল তাঁহাদের চক্ষে দেখা দিল। হৃদয়ের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রব্যাদি তুলিয়া রাখিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার মধ্যেই অমৃত ও সুরেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, পিতা আহারে বসিয়াছেন তাহারাও তাঁহার পাশে বসিয়া আহার করিতেছে। মা সেইখানে থাকিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিতেছেন ও বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও শুনিতেছেন। কখনও তাহারা পিতার সঙ্গে একত্রে না হইলে আহার করে না, কখনও তাঁহাদের আহারের সময় মা অন্য স্থানে থাকেন না; তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করেন ও তাঁহাদের কথা শুনেন। এরূপ করাতে তাঁহারা বড়ই সুখে থাকেন। যথার্থই পরিবারটী যেন স্বর্গের দেবতাদের মত।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "ও পাড়ার গোপালের মা আসিয়াছেন।" অমনি অমৃতের জননী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। আর এদিকে—? অমনি ভাই দুটীর মুখে কেমন এক আশ্চর্য্য লজ্জা ও আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহারাই বুঝিল আর কেহই দেখিতে পাইল না। আবার সেই রকম বুক ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিতে লাগিল। "কিরূপ হইবে কে জানে?" তাহারা খাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, আর আঙ্গুল দিয়া মিছামিছি কি যেন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মার সঙ্গে গোপালের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই অমৃত ও সুরেন দুজনকে কত যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা আর কি বলিব? পিতা বাড়ী ছিলেন না, এ সমস্ত বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" গোপালের মা তখন তাঁহার দুঃখের অবস্থা সমস্ত বর্ণনা করিয়া তার পর বলিলেন "আহা! আপনাদের ধন্য দয়া। দীন হীন দুঃখীর প্রতি যে আপনারা মুখ তুলিয়া চাইয়া দেখেন এর তুল্য মহৎ কার্য্য আর কি আছে? আহা! গোপাল আমার "বৈ বৈ" করিয়া সারা হইতেছিল, বৈগুলি পাইয়া যে তার কি আহ্লাদ হইয়াছে তা আর বলিতে পারি না। সে সে গুলি একবার বুকে রাখিতেছে, একবার চুম খাইতেছে, আর এখনও পড়িতেছে। আমরা আপনাদের দয়াতে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইয়াছি তা আর কি বলিয়া জানাইব? আনন্দে আমাদের হৃদয় পূরে গিয়েছে। আহার করিতে বসিতেছিলাম, কিন্তু এ আনন্দ ও এ কৃতজ্ঞতা আপনাদের না জানাইয়া আহার করা অনুচিত মনে করিয়া তাই মনের কথা বলিতে আসিয়াছি। ছেলে দুটী দীর্ঘজীবী হউক, আপ-

নাবাও মনের সুখে থাকুন আর এমনি ক'রে দীন দুঃখীর উপকার করুন।"

বালক দুটী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। জননী বুঝিতে পারিলেন, আর তাই একটু একটু হাসি তাঁহার মুখে শোভা পাইতেছিল। পিতা কিছুই ত বুঝেন নাই, কাজেই অবাক্ হইয়া একবার স্ত্রীর দিকে একবার পুত্রদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি গোপালের জন্য বৈ পাঠাইয়া দিয়াছিলে কি?" তিনি বলিলেন—"না, আমি জানিওনা যে গোপালের বৈ আছে কিনা, আর কি কি বৈ পড়ে তাও জানি না।—"

অমনি ব্যস্তভাবে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন—"সে কি? তবে ছেলেরা সে সব নূতন বৈ, কাগজ, শ্লেট, জামাজুটো—সব শুদ্ধ প্রায় ৫ পাঁচ টাকার জিনিস, কোথা পেলে? তাইত? আমরা মনে করেছিলাম যে আপনারা বুঝি ওদের হাতে দিয়ে সেগুলি দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? ওমা! আমার যে ভয় হচ্ছে। কেন বাবা তবে তোমরা মা বাপ্‌কে না ব'লে এমন কাজ কর্লে?"

মা বলিলেন—"চিন্তা কি? আপনি অমন করেন কেন? ওরা বেশ কাজই করেছে। আমি বড় সুখী হলেম। ওদের যে এরূপ বুদ্ধি হয়েছে, এর চেয়ে আর আমার সৌভাগ্য কি হতে পারে?" এখনও অমৃতের পিতা কিছু বুঝিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন যে—"আমি আজ প্রাতে দীন দুঃখীকে দয়া করা উচিত এই উপদেশ পূর্ণ একখানি বৈ ছেলেদের পড়িতে দিয়াছিলাম। সেখানি পড়িয়া উহাদের কেমন উপকার হইল তাই পরীক্ষা করিবার জন্য, ওরা দুপুর বেলা যেমন বাগানে যাবে অমনি পথের উপর পাঁচ টাকার একখানা নোট রাখিয়া এলাম। নোট পাইয়া যদি না বলিত, তাহা হইলে ভয়ানক দুঃখিত হইতাম আর খুব রাগ করিয়া বকিতাম। তা দেখি যে পাইয়াই নোটখানি আমার কাছে আনিল ও যার নোট হারাইয়াছিল তাহাকে দিতে বলিল। বড় খুসী হলেম ও একটু সন্ধান ক'রে কারও নয় প্রমাণ হলে বলিলাম, 'ইহা দ্বারা তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার এ তোমাদেরই।' এখন আরও আনন্দিত হলেম যে নোটের অতি উত্তম ব্যবহারই হইয়াছে।"

আহ্লাদে অমৃতের পিতা একেবারে গলিয়া গেলেন, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে অমৃত বসিয়াছিল, তাহাকে কোলে বসাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। অমৃত খুব কাঁদিতেছিল, বাবার কোল হইতে নামিয়া আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমায় না বাবা। আমায় না। আমি বড় হ'লে কি হয়? সুরেন আমার বড় ভাই। সুরেনকে কোলে করুন। আমি বড় নীচ, আমি বড় নীচ। আমি এ টাকার দ্বারা নিজেদের জন্যই কিছু পছন্দমত জিনিস কিনিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। আমি বড় নীচ। আমি এ আদরের উপযুক্ত নই। সুরেনই এই ভাল কাজের মূল, তাকে খুব আদর করুন, সে আমার দাদা। আমি বড় নীচ।"

পুত্রের এই সরল সত্যপ্রিয়তা ও সাধুভাব দেখিয়া তিনি অমৃতকে আরও আদরের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিলেন ও আনন্দাশ্রুতে তাহার মুখ ভাসাইয়া দিলেন। সুরেনকে তাহার মা কোলে লইয়া বার বার মুখে চুম্বন করিতে লাগি-

লেন্ন ও বলিতে লাগিলেন "ধন্য আমাদের জীবন যে এমন পুত্র পাইয়াছি। দশ বছরের ছেলে তুমি বাবা, তোমায় এর মধ্যে এমন বুদ্ধি হইয়াছে?"—

সুরেন মার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। নিজের সুখ্যাতি সে এত শুনিবে কিরূপে? যে লজ্জায় গোপালদের বাড়ীতে গেল না, গোপালের সহিত দেখা হইলেও যে জিনিসগুলি দিয়াই সুখ্যাতি পাইবার ভয়ে ও লজ্জায় হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিল, সে কি কখন মার মুখে এত প্রশংসা শুনিতে পারে?

গোপালের মা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল এ পৃথিবীতে বুঝি আর তিনি নাই, স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া আছেন। প্রশংসা শুনিতে সুরেনের অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন "কেন বাবা! তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তার প্রশংসা নেবে না কেন?" বালক বিনীতভাবে বলিল—"সে কি মা! আমি কি ভাল কাজ করিয়াছি? গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত মার কাজ। সকালবেলা বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিলাম, তাই ত সেই হিত কথার বৈখানি পড়িতে দিলেন? নহিলে ত এ বুদ্ধি আমাদের হইত না। আবার শুধু বুদ্ধি হ'লেই বা কি হবে? দেখুন দেখি, সেই বুদ্ধি কাজে দেখাবার সুবিধার জন্যে আমাদের সোনার মা কেমন আবার একখানি নোট সুমুখে ধরে দিলেন, নহিলে কি হত? সমস্তই তাঁর কাজ। সমস্তই মার কাজ! ওগো, এমন মা আর কারও নাই, কারও হয় না। আমাদের যেমন মা এমন আর হয় না।" এই বলে মার গলা জড়াইয়া বুকের ভিতর মাথা দিয়া রহিল।

উটপক্ষী।

জকাল উপরে যে পক্ষিটীর ছবি দেখিতেছ উহাকে সকলেই "অচ্ টিচ্" বলিয়া ডাকেন। ইহার ইংরাজী নাম 'ostrich'; এবং এই নাম দ্বারাই এই পক্ষিটী সকলের নিকট পরিচিত। ইহার বাঙ্গলা নাম উট পক্ষী। প্রাচীনকালে অ্যারিষ্টটল্, প্লিণী প্রভৃতি বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে (camel bird) উট পক্ষী কহিতেন।

উট জন্তুর সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে উট-পক্ষী কহে। যেস্থানে উট পাওয়া যায়, সেই স্থানে উট-পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায়। উটের ন্যায় ইহার বুকের হাড় অতি কঠিন ও শক্ত এবং শয়ন করিবার সময় উটের ন্যায় বুকে ভর করিয়া শয়ন করে। উটের ন্যায় ইহার শরীরের মধ্যভাগ অতিশয় বৃহৎ। উভয়ের অবয়ব, চলন ও ভাবভঙ্গী প্রায় একই রকম। উভয়ে গলা টান্ করিয়া মস্তক উঁচু রাখে। উটেরা চলিবার সময়ে চারি পা প্রায় একত্র করিয়া চলে; এবং উট-পক্ষীরা চলিবার সময়ে ১০।১২ হাত অন্তর পা ফেলে। উটেরা চারি পায়ে যত টুকু যায়গা অধিকার করে; উট পক্ষীরা দুই পা দ্বারাই প্রায় ততটুকু স্থান অধিকার করে। এজন্য ইহাদিগকে দূর হইতে উটের দল বলিয়া সময়ে সময়ে মানুষের ভ্রম হয়। প্রভেদের মধ্যে এই যে উট-পক্ষীর দুই পা এবং

শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই পাখায় ঢাকা, আর উটের চারি পা এবং শরীর ছোট ছোট রোমে আবৃত।

প্রাচীনকালে উট-পক্ষী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত। শুনা যায় যে পুরাকালের রাজারা উট-পক্ষীর ডিম্ব প্রজার নিকট হইতে উপঢৌকন পাইতেন। এক্ষণে কেবল আফ্রিকা দেশেই উট-পক্ষীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে। একদলের সংখ্যা চারি কিম্বা পাঁচটীর বেশী নহে। ইহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে, এমন কি এক

ঘণ্টায় ২৬ মাইল চলিতে পারে। অতি কষ্টভোগ কালে গাভী যে প্রকার চীৎকার করে, ইহাদের স্বাভাবিক ডাক সেই রকম। কোন কোন উট-পক্ষীর শব্দ সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় শুনা গিয়াছে।

উট-পক্ষীরা যাহা পায় তাহাই ভক্ষণ করে, এমন কি একটি পাখী একবার তামা ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। মত্ত অবস্থায় ইহারা পাথর, বালি, হাড় এবং ধাতুজ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে। কিন্তু বীজ, জাম প্রভৃতি ছোট ছোট ফল, গাছের পাতা এবং ফড়িং ইহাদের স্বাভাবিক খাদ্য।

একটি পুরুষ পক্ষীর ২।৩টি স্ত্রী থাকে। তাহারা সকলেই একস্থানে স্তূপাকার করিয়া ডিম্ পাড়ে। ডিম পাড়িবার জন্য কোন প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করে না, একটু বালি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করে এবং এই গর্ত্তের মধ্যেই ডিম রাখিয়া তা দেয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ে এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ডিমে তা দেয়। যদি ডিম ফুটিতে দেরী হয়, তবে পুরুষ পক্ষী রাগান্বিত হইয়া, বুকের চাপে ডিম ভাঙ্গে এবং তাহা হইতে ছানা বাহির করে। এই প্রকারে ছানাগুলি জন্মিবার সময় বিশেষ কষ্ট পায়।

ইহাদের পাখা দ্বারা ইউরোপের এবং আমেরিকার ভদ্র মহিলারা নানা প্রকার বেশভূষা করেন। বড় বড় যুদ্ধে যে সমুদায় বীরপুরুষ জয়ী হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উট-পক্ষীর পাখা মস্তকে ধারণ করেন। এই পাখার এত আদর এবং এত কাট্‌তি যে প্রত্যেক বৎসরেই প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মূল্যের পালক আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। এই সমুদয় কারণে উট-পক্ষী শিকার করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল ব্যবহৃত হয়। লিবিয়া দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য-রূপে উট-পক্ষী শিকার করা হয়। একজন লোক ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া একটি মৃত উট-পক্ষীর চর্ম্মে সমস্ত শরীর আবৃত করে। গলার চামড়ার মধ্যে এক হাত দিয়া ঠিক উটপক্ষী যেমন ঘাড় উচু করিয়া যায় ইহারাও সেইরূপ যায়। ঠিক উট-পক্ষীর ন্যায় চলিয়া বেড়ায়, কখন ঘাড় নিচু করে, কখন বা গলা টান্ করিয়া মুখ উচু করে, আবার কখন বা ছট্ ফট্ করিয়া পাখা নাড়ে। এই প্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে উট-পক্ষীর দলে মিশে। উট-পক্ষীরা প্রতারণা বুঝিতে পারে না। শিকারী যখন কোন পাখীর অতি নিকটে উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। পাখী চীৎকার করিতে করিতে পড়িয়া যায়; শিকারী কিন্তু আবার উট-পক্ষীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রকার একে একে সমুদায় পাখী বধ করে।

মরক্কো দেশে শিকারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করে। শিকারীরা এক দল উট-পক্ষীর পিছু পিছু ঘোড়া চালায়। এবং আর এক দল উটপক্ষীরা যে দিক দিয়া যাইবে সেই পথে লুকাইয়া থাকে। উটপক্ষীরা বৃত্তাকারে দৌড়ায় শিকারীরা ইহা জানিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাবে দুই দল দুই স্থানে থাকে। শেষোক্ত দলের নিকট উট-পক্ষীরা উপস্থিত হইলেই শিকারীরা তীরের দ্বারা এই পক্ষীদিগকে বিনাশ করে। কোন কোন স্থানে উট-পক্ষীরা যেখানে জল খাইতে যায় সেই স্থানে শিকারীরা লুকাইয়া থাকে; যেই পক্ষীরা জল খাইতে আসে আর অমনি শিকারীরা তীর দিয়া এই নিরপরাধী পক্ষীদিগকে বধ করে। আবার কোন কোন স্থানে শিকারীরা উট-পক্ষীরা যেখানে ডিম পাড়ে সেই স্থানে গিয়া ডিমগুলি সরাইয়া নিজেরা বালীর নীচে

লুকাইয়া থাকে। কেবল মাত্র চক্ষু দুইটী বাহিরে রাখে। যেমন পক্ষীগুলি ডিমে তা দিতে আসে আর অমনি তাহাদিগকে বধ করে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে ইহাদিগের বংশ ধ্বংস করা হইতেছে।

কোন কোন জাতি এই পক্ষীর ডিম খায়। মাংস পর্য্যন্তও বাদ যায় না। পূর্ব্বকালে রোম-নগরে এই পক্ষীর মাংসের বড় আদর ছিল। শুনা গিয়াছে এক রাজা একদিন এক মহোৎ-সবের জন্য ৬০০ এই নির্দ্দোষী পক্ষীর প্রাণবধ করাইয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে আফ্রিকায় এক্ষণে কলে উট-পক্ষীর ডিমে তা দেওয়া হয়। কলে যে সমুদায় ছানা হয় তাহারা বেশ সবল এবং সুস্থ হয়, তাহাদিগকে অতি যত্নে পালন করিতে হয়। মাতার নিকট থাকিলে তাহারা যে ভাবে বাস করে, তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবে রাখা হয়।

পূর্ব্বে উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে মানুষ বেড়াইত। রোমের মহিলারা গৃহ-পালিত উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেন। এখনও কোন কোন স্থানে ইহার উপর মানুষ চড়িয়া বেড়ায়। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থানে গাড়ীও টানা হয়।

উট-পক্ষী প্রায়ই ধবল বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন প্রকারের উটপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জাতি এক এক প্রকার রঙ্গের হয়।

নীতি কথা।

১। একখণ্ড লৌহ ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া তাহা নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যবহার করিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। দেখ, ব্যব-হৃত চাবিগুলি কেমন পরিষ্কার। সেইরূপ পরি-শ্রম অপেক্ষা আলস্য মনুষ্যের শরীরকে অধিক বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য করে।

২। পরিশ্রম সৌভাগ্যের দ্বার-স্বরূপ। দরিদ্রতা আলস্যের চির-সহচর।

৩। বর্ত্তমান কালে যে কাজ করা যাইতে পারে ভবিষ্যতে করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিও না। কেননা বর্ত্তমান তোমার আয়ত্বা-ধীন, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর কি কখন নির্ভর করিতে পার? "করিবার যাহা, আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"

৪। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়। কোন কার্য্য একবারে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ভগ্নোৎসাহ হইও না, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

৫। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। ইচ্ছা হইতে প্রতিজ্ঞা জন্মে এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইলে কার্য্য-সিদ্ধি নিশ্চিত।

৬। একটী সংস্কৃত শ্লোকে কথিত আছে, হস্তী দেখিলে সহস্র হস্ত দূরে, ঘোটক দেখিলে শতহস্ত দূরে, এবং শৃঙ্গবিশিষ্ট জীবদিগ হইতে দশ হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু দুর্জ্জন-দিগের সহিত দেখা হইলে সেস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কুসংসর্গ যে উন্নতির ভয়ানক প্রতিবন্ধক তাহা কে অস্বীকার করিবে?

৭। তুমি কিরূপ লোকের সহিত বাস করিয়া থাক জানিতে পারিলে তোমার স্বভাব কিরূপ আমি বলিতে পারি। সংসর্গ দোষে কত সাধু ব্যক্তির স্বভাব বিকৃত হইয়াছে কে গণনা করিবে?

৮। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা, পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা যেরূপ একাগ্র চিত্তে সর্ব্ব প্রকার বিলাসের ভাব দূর করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, অধ্যয়নকালে ছাত্রদিগের সেইরূপ একাগ্র ও সুখস্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক। কবি বলেন

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

৯। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাক, মানসিক সুস্থতার প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রোধ, হিংসা, প্রভৃতি মনের ব্যাধি-স্বরূপ। এতদ্দ্বারা বিকৃত হইলে, মনের ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং বিদ্যোপার্জ্জনের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক জন্মায়।

১০। শুধু বিদ্যালাভ করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে না। স্বভাব বিশুদ্ধ হওয়া চাই। দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইলেও ঘৃণার পাত্র। মণিবিশিষ্ট সর্প কি ভয়ানক নহে?

সততা।

আমাদের দেশের অন্ধদের জীবন ভিক্ষার উপরই নির্ভর করে; কিন্তু বিলাতে অন্ধ ব্যক্তিদের অবস্থা অন্যরূপ, তাহারা লেখা পড়া শিখিয়া বা অন্য কোন প্রকার কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটী অন্ধ বালিকার সততা সম্বন্ধে একটী গল্প বলি।

বিলাতে সময়ে সময়ে ভয়ানক কুয়াশা হয় এবং এইজন্য দিন রাত্রির মত হয়। দিনে বাতি না জ্বালাইলে কিছুই দেখা যায় না। যে সময়ে দিনের বেলায় শ্রমজীবীদের বাতি জ্বালাইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয় সেই সময়ে কোন কোন জিনিসের দর চড়িয়া যায়। বাতি জ্বালাইতে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা পোষাইবার জন্যই চড়া দরে জিনিস বিক্রী করিতে হয়। একবার এইরূপ কুয়াশার সময়ে একটী অন্ধ বালিকা ঝুড়ি বুনাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অন্ধের দিন রাত্রি সবই সমান। কুয়াশার জন্য তাহার বাতি ক্রয় করিতে হয় নাই এবং কাজে কাজেই অতিরিক্ত খরচও কিছুই হয় নাই।

কুয়াশার জন্য তখন বিলাতে ঝুড়ীর দর চড়িয়া গিয়াছে। চড়া দরে ঝুড়ী বিক্রী করিয়া যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল তাহা এই অন্ধ বালিকাটী এক ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল "এ অতিরিক্ত লাভ আমার প্রাপ্য নহে, কারণ কুয়াশার জন্য আমার বাতি জ্বালাইতে হয় নাই। এ অতিরিক্ত লাভ পরের কল্যাণ সাধনার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত।" এই রূপ যাহার সততা তিনিই ধন্য।

গরিব হইয়াও যদি সাধু হওয়া যায় তাহা হইলে লোকের নিকট গণ্য মাণ্য হওয়া যায়। সকলেরই সৎ হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমচেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকলের জীবনে দুইটী উদ্দেশ্য থাকা উচিত, প্রথম উদ্দেশ্য লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করা. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সৎ পথে থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করা।

সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। টেলিগ্রাফ্।

২। ১ম পুত্র ৯টী; ২য় পুত্র ৬টী এবং ৩য় পুত্র ২টী ঘোড়া পাইবে।

ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

শিশুর হাসি।

(১)

হাসরে আবার ছেলে হাস একবার,
হাসি মুখখানি তোর বড় ভালবাসি ;
ফেলিয়া ঘরের কাজ তাই বার বার,
দেখিবারে আসি তোর আহ্লাদের হাসি।

(২)

অমল বদনে দুটী কমল নয়ন
আনন্দে যখন আহা করে ঢল ঢল ;
নিরখি সে শোভা হয় পুলকিত মন,
আহ্লাদে ফুটিয়া উঠে হৃদয় কমল।

(৩)

মধুর অধরে মিষ্ট আধ আধ স্বরে
কি বল তখন, কিছু বুঝিতে না পারি ;
কিন্তু সেই সুধা রব হৃদয় ভিতরে
ঢালি দেয় শত ধারে যেন শান্তি বারি।

(৪)

ধরিয়া তোমায় বক্ষে পরম যতনে
জাগিয়া পোহাই নিশা রোগের সময় ;
অনাহারে থাকি কভু অম্লান বদনে,
তোমা লাগি যার প্রাণে সব দুঃখ সয়।

(৫)

কিম্বা তোর হাসি মাখা চাঁদ মুখখানি
না হেরিলে ভয়ে প্রাণ করে যে ক্রন্দন ;
না শুনিলে একদিন ও মুখের বাণী,
অন্ধকার জ্ঞান হয় সকল ভুবন।

(৬)

হাসি হাসি কর খেলা শুইয়া শুইয়া,
কও কথা মৃদু মৃদু পাখীর মতন ;
আদরে ও মুখ খানি চুম্বন করিয়া
স্নেহ ভরে বার বার দিই আলিঙ্গন।

(৭)

কোথাকার হাসি এই, কি ভাবের ভাষা
না জানি ভিতরে তোর আছে কোন জন !
যত দেখি শুনি তত বাড়ে যে পিপাসা,
এ নয় অন্যের খেলা খেলে নিরঞ্জন।

ফুল।

খন রাত্রি ভোর হয়, পাখীগুলি বাগানে কেমন সুন্দর গান গাহিতে থাকে; এই সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গে ভাঙ্গে অথচ ভাঙ্গে না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি যে সরোদিদি আর পিসীমা বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া যান। একটু পরে আমিও উঠি; সরোদিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি যে, সে আর পিসীমা ফুলের বাগানে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছে। আমি সরোদিদির আঁচল ধরিয়া পিছু পিছু যাই আর নিচুতে যে সকল ফুল ফুটে, তার দু একটা দৌড়িয়া তুলি।

কিন্তু প্রত্যহ দেখি যে পিসীমা ফুলগুলি একখানি পরিষ্কার তামার বাসনে রাখেন; এবং ঐ গুলি দিয়া গম্ভীর ভাবে শিবপূজা করেন। আর সরোদিদি ফুলগুলি দিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথে; একছড়া গলায় পরে আর একছড়া নিজে খোপায় পরে।

আমি অনেকদিন ভাবিয়াছি একটু ফুল দুই কার্য্যে ব্যবহার হয় কেন? আমি ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একদিন পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি ফুলগুলি মিছামিছি নষ্ট কর কেন? গাছে থাকলেত বাগানের কেমন শোভা হয়; আর না হয় আমাদের দিও আমরা দুই ভাই বোন মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব।"

পিসীমা প্রথমে হাসিয়া বলিলেন "বাছা বড় হও, বুঝিবে ফুল কি জিনিস।" এই বলিয়া একটী গোলাপফুল হাতে ধরিলেন এবং তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল তখন "ভগবান্, তুমিই ধন্য" বলিয়া সেই তামার বাসনে অতি ধীরে ফুলটী রাখিলেন। আমি ভাবিলাম একি! ফুল দেখিয়া পিসীমা কান্দিলেন কেন?

যাহাহউক আমি তখনই সরোদিদির নিকট যাইলাম; যাইয়া দেখি সে কি একখানা বই পড়িতেছে আর ফুলের মালা হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছে। আমি অবাক হইলাম, ভাবিলাম ফুল কি এমনই পদার্থ যে পিসীমা দেখিতে দেখিতে কান্দিয়া ফেলিলেন আবার সরোদিদিও ফুল দেখিয়া এমনি অন্যমনস্ক হইয়াছে যে আমি ঘরে ঢুকিয়াছি তাহা টেরও পেলে না! করি কি, সরোদিদি বলিয়া ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্র সে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল যেন সে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিল। আমি ঐ ফুলের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও বলিলাম। সরোদিদি যে বই খানা পড়িতেছিল তাহার পাতা খুঁজিয়া এই কথা কয়টি পড়িল।

"কিন্তরে কুসুম! আর্য্যসুতগণে
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে,
ঠিক ব্যবহার, সেই রে তোমার
সেই রে সদ্গতি ভাবি মনে মনে;
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমার মহিমা মানব জানেনা
তব গুণগ্রাহী সুধু দেবগণে।

আর বলিল "দেখ বিজয় আমি স্কুলে এই বইখানি পড়ি। আজ এই কয়টি কথা যখন পড়িলাম, তখন ভাবিলাম হায়! আমাদের চক্ষু নাই। প্রত্যহ ফুল বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই, কত ফুল তুলি, মালা গাঁথি, গলায় পরি, তবু ফুলের জন্ম কেন তাহা বুঝিলাম না।" এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল আর ফুলের মালা এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

আমি সরোদিদির ঐ কথা কয়টি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। যখনই ফুল বাগানে যাই তখনই ঐ কথা কয়টির অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি। অনেক দিবস চিন্তা করিয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি যে পিসীমার কান্দিবার কারণ আছে। আমি যত জিনিস দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ফুলই সর্ব্বাপেক্ষ সুন্দর। ফুল কাহারও আদর চায় না। সে আপনমনে ফুটে আবার আপনি শুকাইয়া যায়। ফুল দেখিলে চোখের তৃপ্তি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও তৃপ্তি হয়। ফুলের জন্ম মালার জন্য নহে, সরোদিদির খোপার জন্যও নহে। ফুল কোথায় না আছে? সকল দেশে সকল সময় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর জিনিস যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে সর্ব্বত্র ইহা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটি যখনি ভাবি তখনই পিসীমার চোখের জল আর সরোদিদির সেই কেমন এক ভাব মনে পড়ে আর ভাবি যিনি সরোদিদির বইতে এমন সুন্দর কথা কয়টি লিখিয়াছেন তিনি আমাদের পূজনীয়, তিনি আমাদের শিক্ষা-কর্ত্তা। আমি যখনই স্কুলের নিকট যাই তখনই যেন সে আমাকে হাসিয়া হাসিয়া বলে "বিজয়, দেখ আমি কেমন সুন্দর, আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কত সুন্দর তাহা সহজেই বুঝিতে পার। আবার দেখ তাঁহার কেমন দয়া, তিনি তোমাদের তৃপ্তির জন্য এমন সুন্দর জিনিসকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাখিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে কখন ভুল না।"

"মা তো তবে মরিয়া যায়?"

প্রতিভার বয়স ১০ বৎসর। সে স্কুলের মধ্যে একটী ভাল মেয়ে, পড়া শুনায় তার মত আর একটীও নাই বলিলে হয়। দেখিতে বড়ই সুন্দর—যে তাহাকে এক দিন স্কুল থেকে আস্‌তে দেখে সেই অবাক্ হয়ে খানিক ক্ষণ চেয়ে থাকে। এমন শান্ত মূর্ত্তি, এমন হাসি হাসি মুখখানি, এমন সুগোল চক্ষু দুটী, ক্লাশের অন্য মেয়েদের আর কাহারও নাই। সকল মেয়েদের সঙ্গে কেমন ভালবাসা। চমৎকার! দেখিতেও যেমন স্বর্গের দেবতাদের মেয়ের মত, গুণেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে প্রতিভার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এমন বস্ত্র আর কোথা নাই! আহা! ধন্য তার মা, যাঁর ভাগ্যে এমন মেয়ে পরমেশ্বর দিয়াছেন। তাহারই মুখ চেয়ে বিধবা পতির শোক ভুলিয়া আছেন।

কাহারও সুখ্যাতি করা বড় সুখের কাজ। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য সে যে কাহারও দোষের কথা প্রকাশ করে। সত্যের জন্য কিন্তু আমরা

আজ এক দিকে যেমন প্রতিভার গুণ গুলির প্রশংসা করিলাম, যদি তেমনি আবার তাহার যে একটি ভয়ানক দোষ ছিল সেটী না বলিতা হলেত ঠিক উচিত হয় না। তাই বলিতে হইল। অল্প বয়সে পিতা মরিয়া যাওয়ায় প্রতিভা মার বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। এজন্য মা তাহাকে একেবারে আপনার প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। ভোরে উঠিয়া আগে খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উঠাইতেন। মুখ হাত ধুয়াইয়া দিয়া ভাল কাপড় পরাইয়া বাড়ীর পাশের ফুল বাগানটীতে বসিয়া তাহাকে আপনি খাবার খাওয়াইয়া দিতেন। তার পর পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিলে তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়া দিয়া ভাত খাওয়ানের আয়োজন করিতেন। পড়া হইলে আপনি খাওয়াইয়া ধুয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিতেন ও যতক্ষণ দেখা যাইত বাড়ীর ছাত থেকে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তারপর অন্য গৃহকর্ম্ম করিয়া ও আপনি আহার করিয়া ছুটী হইবার সময়ে আবার ছাতে বসিয়া কখন প্রাণের ধন বাড়ী আসিবে সেই অপেক্ষা করিতেন। মা কোথায় না ছেলে মেয়েকে ভাল বাসে?—কিন্তু প্রতিভার মা তাকে যে কি চক্ষে দেখেছেন সে বলা যায় না, সে আর কেহ বুঝিতেই পারে না। এত আদরের বলিয়া প্রতিভাকে কেহ কখন কোন কারণে তিরস্কার করিতে পাইত না। পড়া শুনা উত্তম হইত বলিয়া বিদ্যালয়েও কখন শাস্তি পাইতে হইত না। এজন্য সে কিছু বেশী একগুঁয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। যা ধরিত তা চাই ই চাই, না হলে কাহারও নিস্তার নাই। বুঝাইলেও বুঝিবে না, বলিলেও শুনিবে না,—ভয়ানক আবদার! এজন্য মাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। মধ্যে মধ্যে রাগে এমনি অজ্ঞান হইয়া যাইত যে মাকে মারিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তপাতই করিয়া দিত। মুঠা করিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া দিত। তবুও মা কিছু বলিতেন না। যা চাহিত, দিতেন আর নির্জ্জনে কাঁদিতেন। তাঁহাকে শাসন করিতে বলিলে বলিতেন "জ্ঞান হইলেই ভাল হইয়া যাইবে। যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে চির দিন ওরূপ বুদ্ধি থাকিবে না।" কি আশ্চর্য্য! যে মেয়ে অন্য সময়ে এমন মধুময় কথা বলে, এমন চমৎকার পড়া করে, সমবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে এমন ভালবাসা যার,—সেই আবার বাড়ীতে এমন! এদিকে মা না হলে যার এক দণ্ড চলে না, মার হাতে না হলে যার খাওয়াই হয় না, মা ভাত মেখে দিবেন, মাছ বাছিয়া দিবেন, কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইবেন,—এ না হইলে যার এক দিন চলে না, সেই সোণার পুতুলই আবার রাগ হলে যেন আর একজন! যেন ঘাড়ে কি ভূত চাপে। আশ্চর্য্য!

উপরে যে দোষের কথা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা দৈ পড়িলেই সব দুধ নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই প্রতিভার প্রতি বিরক্ত ও তাহার চরিত্রের জন্য খুব দুঃখিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বেচারা কি করিবে? অনেক দিনের অভ্যাস যায় না; আর যাবার জন্য মাও কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না। তার মনে হইত মাকে ঐ রকম করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। অন্যায় প্রেম! আশ্চর্য্য কু-বুদ্ধি!!

সে দিন এক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্কুলের ছুটীর পর বিমলাদের বাড়ীতে যাবার কথা আছে। মাকেও বলিয়া আসিয়াছে। স্কুলের ছুটী হইলে বিমলা প্রতিভার গলাটী জড়াইয়া মনের আনন্দে

সূচী-পত্র।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক।
অক্ষয়কুমার দত্ত (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	১৭
অদ্ভুত কৌশল।	ভুবনমোহন রায়	১৫২
অন্ধদিগকে দয়া কর (সচিত্র।)	অন্নদাচরণ সেন	১১৪
আই আই (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	২৪
আকাশ।	শ্রীনিঃ, শিলং	১৮৫
আখ্যান মালা।——		
(১) বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি?	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	২৬
(২) নামতে নামতে সামলাতে পারিনি।	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	২৬
(৩) কোনটা বেশী মন্দ?	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	২৭
আগামী বৎসরের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।		১৯২
আমাদের দেশের লোকের দয়া।	বঙ্কুবিহারী গুপ্ত	১২৬
আশ্চর্য্য উদ্ভিদ (সচিত্র।)	শশিভূষণ বিশ্বাস	৯৩
আশ্চর্য্য শিক্ষা (সচিত্র।)	শশিভূষণ বিশ্বাস	১২৯
আহা! কি দুঃখ (সচিত্র।)	মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ	১৮৬
ঈশ্বরের দয়া (পদ্য।)	জনৈক বঙ্গমহিলা	১০১
উট পক্ষী (সচিত্র।)	বিপিন বিহারী সেন	১৭১
কলির কুম্ভকর্ণ।	বিহারীলাল গুহ	৯৫
কাক ও কোকিল (পদ্য।)	সম্পাদক	৯৫
কাটামুণ্ড কথা কয় (সচিত্র।)	অম্বিকাচরণ সেন, বি, এল	৫৯
কালার ঘরে ধলা ছেলে।	সম্পাদক	১৩৮
কুসঙ্গের দোষ।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ	১২৩
কেরাণী পাখী (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	১১
গাধা সিংহ (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	৭৭
ছেলে খেলা (পদ্য।)	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১৬৯
ছেলে বেলায় নেলসন (সচিত্র।)	শশিভূষণ বিশ্বাস	১০৮
ঠাকরদাদার গল্প (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ১৩, ১৯, ৩৪, ৪৯, ৭০, ৮১,	১০৫
৺ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (সচিত্র।)	সম্পাদক	৮৯
৺তারকনাথ প্রামাণিক (সচিত্র।)	সম্পাদক	৭৩
তৃতীয় বর্ষ।	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	১
দুই ভাই।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৪৮, ১৬৯
ধাঁধা।	১৬, ৩২, ৪৮, ৬৪ ৯৬, ১৪৪,	১৭৬
নব বর্ষ।	জনৈক বঙ্গমহিলা	৬৫
নিদ্রালু ননী গোপাল (সচিত্র পদ্য।)	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১৫০
নীতি কথা।	প্রিয়নাথ রায়	১৭৫
নূতন গল্প।	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	১১১
পরেশ নাথ মন্দির।	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	২২
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সচিত্র।)	সম্পাদক	১৫৪
পিতা মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)	কুমারী সরলা দেবী	১৬৭

পিপীলিকা (সচিত্র।) ...	অন্নদাচরণ সেন	১৩৫
পূজাবকুটির আমোদ (সচিত্র।) ..	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	১৫৯
প্রকৃত বন্ধু। ..	অন্নদাচরণ সেন ...	১৮৩
প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন। .	রজনীকান্ত গুপ্ত ...	৩৩
প্রাণরক্ষা চাই।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, .	৬১
ফল। ..	বিপিন বিহারী সেন	১৭৮
ভূতের গল্প। ..	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ, ...	২৭
ভেকের পত্র (সচিত্র পদ্য।) ..	বিহারীলাল গুহ ..	১১৮
মনোহর ছবি। ..	ভুবনাথ চট্টোপাধ্যায় .	৫৭
মহাভারতের উপদেশ (দুইটী গল্প।) .	রজনীকান্ত গুপ্ত, ..	১৪৫
মাইকেল ফারাডে (সচিত্র।) .	ভুবনমোহন রায় ..	১৬৩
মাছের কথা (সচিত্র।) ..	শশিভূষণ বিশ্বাস	১০৩
মা তো তবে মরিয়া যায় (সচিত্র।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ..	১৭৯
মূলবর্ণ। ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ, ...	১১৯
যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা। ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ..	৮
রামতনু লাহিড়ী (সচিত্র।) ...	সম্পাদক ...	৪১
লর্ড ডফরীণ (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	৪
লীলার ভয়। ...	কুমারী হেমলতা দেবী .	৬৮
লেখা পড়া কিসের জন্য ? (ভুবনের কাহিনী)	মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ..	৩৮
বসন্ত সঙ্গীত (বালকের রচনা।) .	সামসুদ্দিন ..	৬৩
বালিকাদিগের বিশেষ বিষয়।— ..	..	
নং ১ সেলাই। ..	কুমারী সরলা মহলানবিশ ...	১০
নং ২ সেলাই (সচিত্র।) ..	কুমারী সরলা মহলানবিশ ..	৪৫
বালিকাদের বিশেষ পূজা (একটী সহজ কথা)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৮৯
শিশুর হাসি (পদ্য।) .	চিরঞ্জীব শর্ম্মা .	১৭৭
শিশুর হাসি (মায়ের আদর) সচিত্র পদ্য।	শ্রীনিঃ, শিলং ...	১২৩
শেয়ালের গল্প (সচিত্র।) ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ. ..	৫৩
শোক সঙ্গীত (প্রাপ্ত)	জনৈক বঙ্গমহিলা ..	১১৩
সংকেত। ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ. ..	৫৬
সক্রেটিস। ...	কুমারী কামিনী সেন ...	১৩১
সততা। ...	অন্নদাচরণ সেন ...	১৭৬
সত্যের জয়। ...	উমাপদ রায় ...	৭৮
সত্যের বল (বালকের রচনা) ...	পূর্ণচন্দ্র সেন ...	১৯১
সময়ের সদ্ব্যবহার। ...	অন্নদাচরণ সেন ...	১৪৩
সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন ..	কুমারী হেমলতা দেবী ...	১৩২
সাধুদিগকে কিসে চেনা যায় ? ...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ...	৮৫
সাধের নৌকা (সচিত্র পদ্য।) ...	সম্পাদক ...	১৪২
সুরেশের শিক্ষা। ...	ভুবনমোহন রায় ...	৫
সোহাগ (পদ্য।) ...	জনৈক বঙ্গমহিলা ...	৬
স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন (সচিত্র।) ...	সম্পাদক ...	৯৭
স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ (সচিত্র।)...	ললিতমোহন দাস ...	১৪১
হাসি, কান্না, কোনটা ভাল ? (সচিত্র।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	৬৬

আপনাদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। পথে যে মেয়ের সঙ্গেই দেখা হয় সেই আসিয়া প্রতিভার সোণার হাত ধরিয়া এক গাল হাসিয়া বলে "কি ভাই! আজ যে আমাদের পাড়ায়?" প্রতিভাও মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করে—"আজ ভাই। বিমলার মা যেতে বলেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব।"

বিমলাদের বাড়ী বড় দূরে নয়। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিল। বিমলার মা প্রতিভাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। কতক্ষণ কোলে করিয়া ঘন ঘন মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন ও পড়ার কথা ও মার কথা সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রতিভাও স্বাভাবিক নম্র মধুর ভাবে সমস্ত কথার উত্তর দিল। তার পর তিনি দুজনকে গা হাত পা ও মুখ ধোয়াইয়া এবং মুছাইয়া দিয়া খাবার দিলেন। খাওয়া হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুজনকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট বেড়াইতে গেলেন। বাগানের এক পার্শ্বে একটী ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর। সেই ঘর হইতে কে যেন কান্নার মত স্বরে গান করিতেছে। প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কে, খুড়ীমা?" খুড়ীমা বলিলেন "ও একটা পাগল মেয়ে।" তখন প্রতিভার তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। তিন জনেই আস্তে আস্তে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইয়াই পাগলী বলিয়া উঠিল "কে ও? মা আস্‌ছে? এস এস। আমার মা এস। একি? এক—দুই—তিন? তিন মা? এক হারিয়ে তিন পেলাম? হাঁগা? তোমরা কি আমার মা গা? সত্যি করে বল, তিন জন কি মা? তিন জনই?—কৈ, না, না। আমার মা তোমাদের মত নয়। তাঁর চেহারা কি ও রকম? আমি সন্ধ্যা-বেলা চিন্‌তে পারি নি। আমার মা স্বর্গের মা।

আহা! মা গো! মা!
ওগো আমার মা!

কোথায় তুমি মা ?
আমি যাব মা ! "—

বিমলা ও তাহার মা জান্‌তেন, তাঁদের কাছে পুরাতন কথা ; সুতরাং তাঁরা কেবল চেয়ে রইলেন আর শুন্‌লেন। প্রতিভা আর কখন এ রকম দেখে নাই, শুনেও নাই। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার গায় কাঁটা দিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

পাগলী তার পর ঘরের মেজেতে শুইয়া পড়িল। "এই খানে মা আমার শুয়ে থাক্‌তেন! আহা! এ যে আমার রাজ্ঞ অট্টালিকা। ঠাকুরুণ গো, তোমরা কি এমন বাড়ীতে কখন থাক্‌তে পাও ? ইস্! তা আর হয় না। তোমাদের কি আমার মত মা আছে ? এমন বিছেনা ? হা! হা!

আমার মা হেথা আছেন
আমার মা সেথা আছেন
আমার মা স্বর্গে গেছেন
আমায় ডেকে নে যাবেন।"

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পাগলীর অবস্থা দেখে প্রতিভার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার চক্ষু দুটীর জলে গাল ভাসিয়া গেল। গাল বহিয়া গড়াইয়া চক্ষের জল বুকে পড়িতে লাগিল। সে দিকে মনই নাই। কেবলই পাগলীর শুষ্ক আলুথালু ধূলা মাখা চুল, শাদাপানা ছাইএর মত ক্ষীণ শরীর, পরিধানের কাল ছেঁড়া নেকড়া খানি,—এই সব দেখিতে বালিকা নিমগ্ন। খুড়ীমা ডাকিলেন। চক্ষু মুখ মুছিয়া প্রতিভা চুপ্‌টী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে যাইতে যাইতে পাগলীর কথা সব বলিতে লাগিলেন। কেমন সে মায়ের বড় আদুরে মেয়ে ছিল, কেমন তাহার মা তাহাকে ভাল বাসিত, তার পর জ্বর হইয়া মা মরিয়া গেল, আর সেই অবধি মেয়েটী পাগল হইয়া গিয়াছে। পাড়ার লোক দয়া করিয়া কিছু কিছু খাবার দিয়া যায়। তাই ইচ্ছা হইলে একটু খায়। আর দিন রাত পড়িয়া কাঁদে আর "মা মা" করে।

একটীও কথা না কহিয়া প্রতিভা সমস্ত শুনিল। " মা তো তবে মরিয়া যায় ? " তাহার মনে হইল। রাত্রে বাড়ী আসিল। মা কোলে করিলেন, কোলের ভিতর মাথা লুকাইল, প্রায় অর্দ্ধেক রাত অবধি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া খুব কাঁদিল। মা কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত বুঝাইলেন ; কোন ফল হইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর দিন থেকে প্রতিভা ২। ১ দিন অবধি মার মুখ পানে তাকাইতে পারিত না, স্কুলে যাইত না, কেবলই কাঁদিত। শেষে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল। আর কখন মার মনে কষ্ট দেয় নাই। পাগলীকে দেখিয়া পাগলীর অবস্থা হইতে কেমন শিক্ষা পাইল। এখন প্রতিভা সোণার প্রতিমা, সকল প্রকারেই স্বর্গের দেবী।

প্রকৃত বন্ধু।

এক ধনী সওদাগরের একটী মাত্র পুত্র ছিল; তাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং ছেলেবেলা হইতেই তাহার শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন।

পিতার আন্তরিক ভালবাসা এবং যত্ন সত্ত্বেও পুত্রের পড়া শুনার দিকে মন আকৃষ্ট হইল না; সৎপথে থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে মতি হইল না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের বদ লোক বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পিতা এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন এবং এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন:—"এই সংসারে প্রকৃত বন্ধু বড়ই দুর্লভ; প্রকৃত বন্ধুর অভাবে সুখী হওয়া যায় না। এই যে এত টাকা কড়ি দেখিতেছ, যদি তুমি মিতব্যয়ী না হও তাহা হইলে উহা সমস্তই উড়িয়া যাইবে; এবং টাকা কড়ির দ্বারা যত সুখ পাইতেছ সমুদয়ই ফুরাইবে। কিন্তু তুমি যদি প্রকৃত বন্ধু পাও তাহা হইলে চিরকালই তাহার সঙ্গে সুখে থাকিবে। টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি সমস্তই ব্যবহার দোষে তোমা হইতে বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধু চিরকালই তোমার বন্ধু থাকিবেন; সম্পদে, বিপদে সকল সময়েই তোমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবেন। অতএব তুমি সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক জন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লও। গৃহে বসিয়া এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; এই জন্য তোমাকে বলি যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়া নানা দেশীয় লোক জনের সহিত আলাপ পরিচয় কর। যত তোমার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে ততই তোমার জ্ঞান অধিক হইবে এবং তুমি অনায়াসেই অনেক লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইতে পারিবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি আমার এই উপদেশ শুন এবং এখনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে এত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন "তুমি যে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে আমি তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।" পুত্র নম্রভাবে উত্তর করিল "আপনি আমাকে একটী প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছি তখন দেশ দেশান্তরে আর যাইবার দরকার কি?"

পিতা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "যাহাদিগকে তুমি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ তাহারা কখনই প্রকৃত বন্ধু নহে; মাতালেরা বোতলে যতক্ষণ মদ থাকে ততক্ষণ বোতলের কত প্রশংসা করে এবং যেই মদ নিঃশেষিত হয় আর অমনি বোতলটী মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ইহা তুমি বোধ হয় নিজেই দেখিয়াছ। যতক্ষণ তোমার টাকা কড়ি থাকিবে ততক্ষণ অনেকেই তোমার প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবে। যাহাদিগকে তুমি প্রকৃত বন্ধু বলিতেছ তাহাদিগকে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?" পুত্র

পিতার এই কথাগুলি শুনিয়া কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "আপনি কেন সন্দেহ করিতেছেন? আমি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিতেছি তাঁহারা আমার সম্পদের সময়ে যেমন ব্যবহার করিবেন বিপদের সময়েও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবেন, আপনি ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন।"

পিতা বলিলেন:—"আমার ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে; আজ বাদে কাল মরিতে হইবে; প্রকৃত বন্ধু পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু মনের মত প্রকৃত বন্ধু মিলিল না। তুমি এত অল্প বয়সেই কেমন করিয়া বলিতেছ যে পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছ তাহা বুঝি না। প্রকৃত বন্ধু কি রূপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তাহার একটী উপায় আমি বলিতেছি।" এইবলিয়া তিনি একটী ভেড়া মারিয়া তাহার অধিকাংশ রক্ত তাহার পুত্রের কাপড় চাদরের উপর ছিটাইয়া দিলেন। মৃত ভেড়াটা একটা বড় থলেয় পুরিয়া পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন, এবং এইরূপ অবস্থায় বন্ধুদের বাটীতে গিয়া কি কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। পুত্র এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে তাহার সর্ব্বপ্রধান বন্ধুর বাটীতে প্রথম যাইয়া উপস্থিত। বাটার দরজায় গিয়া বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকামাত্র বন্ধু শশব্যস্তে আসিয়া হাজির। বন্ধুকে দেখিয়া বলিলেন "আমাদের পরিবারের সহিত অমুকের সহিত যে শত্রুতা আছে তাহা তুমি জান, এই মাত্র ভাই তাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া হয়, ঝগড়ার পর হাতাহাতী হয় এবং তাহার পর শেষে কি দাঁড়াইল অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতেছ। পুলিসের লোক জানে যে উক্ত ব্যক্তির সহিত আমাদের শত্রুতা আছে, আমাদের আসিয়াই প্রথম ধরিবে। আমি উক্ত ব্যক্তির শরীরটা থলেয় করিয়া আনিয়াছি। এই মৃত শরীরটা তোমার বাটীতে পুঁতিয়া রাখ।"

বন্ধু সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অনেক ভাবিয়া—চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী বড়ই সঙ্কীর্ণ; আমরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবার স্থান পাই না, তাহার পর কেমন করিয়া মৃত শরীরটার স্থান দিই? বিশেষতঃ তোমাতে এবং আমাতে যে বন্ধুত্ব আছে তাহা সকলেই জানে; পুলিসে তোমার বাড়ী মৃত দেহ না পাইলেই আমার বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসিবে। তাহা হইলেইত চক্ষুস্থির। তোমার প্রাণ দণ্ডের সহিত আমারও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় আমি তোমার এই মাত্র উপকার করিতে পারি যে তুমি যে এ কু-কাজ করিয়াছ ইহা আমি আর কাহাকেও বলিব না।"

ধনীর সন্তান অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না দেখিয়া অন্য একজন বন্ধুর বাটীতে যাইয়া হাজির হইলেন। সেখানেও এইরূপ উত্তর। এইরূপে পঞ্চাশ বাড়ীতে ঘুরিলেন কেহই সাহায্য করিলেন না, কোন স্থানেই সাহায্য না পাইয়া বাটী আসিয়া পিতার নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিল "যাহাদিগকে ভাবিয়াছিলাম যে সুখে দুঃখে সমভাবে কাজ করিবেন আজ দেখিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমাকে এই কল্পিত বিপদের সময়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না।" পিতা তৎপরে বলিলেন "যাহাদিগকে দুঃখে সাহায্য করিতে দেখিবে না তাহাদিগকে বন্ধু বলিও না। যেমন সোণা ভাল কি মন্দ আগুনের দ্বারা পরীক্ষা করা যায় সেইরূপ বন্ধু ভাল কি মন্দ বিপদে না পড়িলে বুঝা যায় না। যে সুখের সময়ে ও দুঃসময়ে বন্ধুর কাজ করিবে সেই বন্ধু;

অতএব এখনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিয়াছ তাহাদিগকে ত্যাগ কর, প্রকৃত বন্ধু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বন্ধু বলিয়া ভাবিও না।”

আকাশ।

বড় ভালবাসি আমি দেখিতে তোমায়,
হে আকাশ। তব রূপে নয়ন জুড়ায়!
যখন যে দিকে আমি করি বিলোকন,
নূতন নূতন রূপে ভুলাও নয়ন!
প্রভাত সময়ে যবে তরুণ-তপন;
মনোহর বেশে আসি দেন দরশন,
নব-রবি রাঙ্গা-ছবি হৃদয়ে লইয়া
মুখ ভরা হাসি টুকু অধরে টিপিয়া;
কি সুন্দর ভাব খানি দেখাও তোমার,
অবাক হইয়া আমি দেখি বার বার!

আবার যখন আহা সেই সে তপন,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শিশুর মতন,
খেলা ধূলা করি সারা দিবসের শেষে,
ধীরে ধীরে আসি আহা আলু থালু বেশে
ঢলিয়া পড়েন তব কোলের ভিতরে,
আদরেতে লও তুমি হৃদয়েতে ধ'রে!
তখন তোমার সেই অপরূপ বেশ,
দেখিয়া নয়নে মোর না পড়ে নিমেষ!

ঘোরতর অন্ধকারে ঘিরি সমুদয়,
যখন রজনী আসি হয় হে উদয়,
সুনীল সুন্দর বক্ষ করিয়া বিস্তার,
থরে থরে পর কিবা তারকার হার!
ঝক-মক করে তারা হীরকের প্রায়,
দেখিয়া সেরূপ আহা নয়ন জুড়ায়।
অবাক্ হইয়া আমি প্রফুল্ল-অন্তরে,
এক দৃষ্টে সেই রূপ দেখি প্রাণ-ভ'রে!

আবার যখন তব হৃদয়ে বসিয়া,
হাসে পূর্ণ-শশী খানি সুধা-বরষিয়া,
শোভার সাগর যেন উথলিয়া উঠে,
সুন্দর সুনীল কান্তি আরো যেন ফোটে!
তখন তোমার সেই মুখ-ভরা হাসি,
আমিত দেখিতে ভাই বড় ভালবাসি!
ভুলে যাই আপনারে—ভুলি এ ভুবন,
কেবল তোমার রূপ করি দরশন!

ক্ষণ-কাল মেঘ-জাল আসিয়া যখন,
তোমার হৃদয়ে বসি করেন গর্জ্জন,
ঝলকে ঝলকে ছোটে বিদ্যুৎ-কিরণ,
ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি হয় বরিষণ;
তখন তোমার সেই গম্ভীর মূরতি,
নিরখিয়া হয় মন পুলকিত অতি!
সে শোভার কাছে যেন কিছু নহে আর,
নয়ন ভরিয়া আমি দেখি বার বার!

কে তোমারে এত রূপ করিয়া প্রদান,
শোভার-ভাণ্ডার করি করিল নির্ম্মান?
অনন্ত তাঁহার কীর্ত্তি, আশ্চর্য্য কৌশল!
তুমিই আকাশ তার পরিচয় স্থল!
অনন্ত শরীরে তব, সুস্পষ্ট-ভাষায়,
তাঁহার মহিমা কথা লেখা গায় গায়!

* ইতালী দেশের কোন একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

পুরুষ প্রধান তিনি সকলের সার,
বার বার নমস্কার চরণে তাঁহার!

আহা! কি দুঃখ!

আহা! ভালুক! তোমার কি দুঃখ! তোমার দুঃখ দেখে যে আমার বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। মনের দুঃখে চুপটী করিয়া বসে আছ, তোমার সে চতুরতা, সে বীরত্ব কোথায়? সে বীরত্বে এক সময়ে তুমি মানুষকে প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল করিতে, গাছে উঠিলেও তাহার নিস্তার থাকিত না, তুমি পিছনে পিছনে গিয়ে তাহাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, সেই বীরত্ব এখন কোথা গেল? যে চীৎকারে একদা তুমি গগন ফাটাইতে, বন কাঁপাইতে, সেই ভয়ানক গোঙান চীৎকার এখন কোথায়? যে নখে এক সময়ে গাছ ছিঁড়িয়া, চিরিয়া, শত খণ্ড করিয়া ফেলিতে সেই নখ তোমার এখন কে এমন ভোঁতা করিয়া দিল? আহা! চক্ষু দুটী মুদিয়া কি ভাবিতেছ? সেই প্রাচীন কালের সুখের কথা, স্বাধীন অবস্থায় যখন বনে বনে বেড়াইতে, তখনকার সুখের কথা কি মনে পড়িতেছে? তাই দুটী চক্ষু রুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছ? আহা! চিন্তায় এমনি মগ্ন হইয়াছ যে একটা হতভাগা বানর তোমার পিঠে চড়িয়া ঘাড়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, তাও টের পাইতেছ না? উপুড় হইয়া বসিয়া আছ, যেন গায়ে জোর নাই, মনে তেজ নাই, বুকে সাহস নাই, প্রাণে কিছু উৎসাহ নাই, যেন 'জন্তুটী' হইয়া বসিয়াছ। নিষ্ঠুর লোক, তোমার দুঃখে কষ্ট পায় না, আবার তোমাকে মারিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। ছিঃ! তোমার অসহায় অবস্থা দেখেও মানুষেরা আহ্লাদ পায়, পয়সা দেয়, দুঃখ হয় না।

নির্দ্দোষী ভাল মানুষ তুমি। মানুষের পাড়া হইতে যে কত দূরে থাক তার ঠিক নাই, পাছে তোমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে মানুষের বাড়ীর ত্রিসীমায় যাও না। নিজের দেশে বনের মধ্যে এটা ওটা খেয়ে নির্জ্জনে প্রাণ ধারণ কর। হিংস্র-স্বভাব দুষ্ট মানুষ তাও সহিতে পারে না। বত্ন করিয়া তোমায় ধরিয়া আনে, আলাতন করে, পিঞ্জরায় বদ্ধ করিয়া রাখে, কত যন্ত্রণা দেয়। শেষে তুমি নিরুপায় হইয়া আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া মানুষের দাসত্ব স্বীকার কর। আহা! কি করিবে বল? পেটে ত খেতে হবে। দুরন্ত মানুষ কথা না শুনিলে খেতে দেবে না, তাই মরে মরেও তার কথা শুনে নেচে নেচে বেড়াও। দেখ ভালুক! তোমার অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয়? যার হয় না সে ভাল লোক কখনই নয়। তোমার এই প্রকার দুরবস্থা দেখিলে যার কষ্ট হয় না সে কখনই ভদ্রলোক নয়। বাঘ, কি গোখরো বা কেউটে সাপ, কি ডাকাত এদের সাজা হলে তত দুঃখ হয়না; কেননা এরা অপরাধী, মানুষের হানি করে। তুমি কিন্তু সহজে কারও হানি কর না; মানুষ আজ কাল তোমায় আলাতন করে, তোমার

আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসে। তাই বাগে পেলে তুমি তাহাকে মারিতে ছাড়না, তবুও বাঘের মত তুমি মানুষের বাড়ী চড়াও করিতে জান না। মানুষ তোমার দেশে গিয়ে তোমার অনিষ্ট করিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? একি কখন হয়? এত ভাল মানুষ কেও আর নাই। কিন্তু তবু দুরন্ত লোক এত তোমার মত শান্ত পশুকে মিছামিছি ক্লেশ

দেয়। পেটের জন্য, সামান্য দুটা পয়সার লোভে বন থেকে তোমায় ধরে এনে আহা! কি যন্ত্রণাই না দেয়?

তুমি যখন নাচ, ভালুক! সকলে হাসে; বলে ভালুকটা কেমন নাচিতে শিখিয়াছে। আমি কিন্তু হাসি না। আমার মনে হয় না যে তুমি নাচিতেছ, মনে হয় যে মনের দুঃখে তুমি ছট্ ফট্ করিতেছ। যখন তোমার নাকের দড়ি ধরিয়া তোমায় দুরন্ত মানব টানে, সেই হেঁচকা টানে তোমার নাকে যে কি লাগে তা লোকেরা বুঝিতে পারে না। আমি তা বুঝি, তাই তোমার দুঃখের "আঁ আঁ" শব্দে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার মুখ দিয়া জল গড়াইতে থাকে, চক্ষু, নাক সব স্থান দিয়ে দুঃখের জল বাহির হয়, সেটা কেউ দেখে না। লোকে বলে ভালুক নাচে। আহা। যার এত যাতনা, তার কি নাচ আসে? আমাকে যদি কেহ আমার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ঐ রকম শাসিত করে, বলে "নাচো নাচো নাচো" তাহ'লে কি আমি নাচি? খুব মারে যখন তখন কি করি, উঠিয়া ঐ রকম করে লাফাই, কিন্তু মনে মনে এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় চিন্তা করি। ভালুক! আমার মনে হয় তুমি ঠিক ঐ রকম কর। কাঁদিতে কাঁদিতে "আঁ আঁ আঁ" শব্দে ধেই ধেই ক'রে লাফাও আর মনে মনে তোমার চালাকে গালাগালি দাও। কোন ক্ষমতা নাই নহিলে তুমি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে, সন্দেহ নাই।

দেখ ভালুক! তোমার নাচে কিন্তু অনেকের উপকার হয়। সেই যে সেদিন তুমি সেই বাবুদের বাড়ীর উঠানে লাঠি কাঁধে করিয়া থপ্ থপ্ করিয়া নাচিতেছিলে,—ঘাড়টী বাঁকাইয়া, ঘুমুরের তালে তালে প্রকাণ্ড ভুঁড়িটী নাড়িয়া নাড়িয়া সেই যে নাচিতেছিলে, আর মাঝে মাঝে "আঁ আঁ" করিয়া নাকীসুরে শব্দ করিতেছিলে—সে দিন বড়ই উপকার হইয়াছিল। সেই বাবুটীর আকার ও তোমারই মতন, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, আর আপাদ মস্তক তোমারই মতন লোম গায়। মদ খেয়ে বাবু মশাই প্রায়ই তোমার মতন নৃত্য গীত করেন, আর পাশে থেকে তাঁহার সঙ্গীরা তাল দেয়। সেদিন কিন্তু তোমার নাচটা দেখে অবধি তাঁর ঘৃণা হয়ে গেছে। একজন সঙ্গী বলিয়াছিল "ভালুকটা আমাদের বাবুর মতন ঠিক নাচে।" সেই মনের ঘৃণায় তখনি তিনি তাদের দূর করে দিলেন, নাকে কানে খত লিখে দিলেন যে আর কখন মদ খাবেন না। এখন তিনি বেশ ভাল হয়েছেন। তাই বলেছিলাম তোমার দ্বারা অনেকের উপকার হয়। আমাদের হতভাগা দেশে তোমার মতন অনেক বাবুতেই নৃত্য করেন, তাঁদের যদি একজনকে ভাল করিতে পার তাহলে তোমার দুঃখভোগ অনেক সফল হয়।

ঘণ্টার মধ্যে দু চারিবার তোমার জ্বর হয়, কেন ভালুক? এদেশের জলবায়ু কি তোমার সহ্য হয় না? তোমাকেও কি ম্যালেরিয়া ধরেছে? তা যাই হউক, কিন্তু আমার মনে হয় যে ওটা কেবল তোমার যন্ত্রণায় হয়। পেটের দায়ে নাচ, খেলা কর, চালকের কথা শুন, কিন্তু যেই মনে পড়ে যে কি ছিলে আর কি হয়েছ, অমনি যাতনার জ্বালায় অস্থির হও আর ধূলায় লুটাইয়া রোদন কর, তাই ক্ষোভে, রাগে, দুঃখে তোমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে। তোমার এত দিনের পরাধীনতাতেও পুরাণ স্বাধীনতার সুখ ভুলাইতে পারে নাই, যখনই মনে হয় তখনই তোমাকে একেবারে পাগল করিয়া ফেলে। আর কত লোক যে চিরদিন পরের অধীন হইয়া অতি নীচ দাসত্ব

করিতেছে অথচ এক দিনের জন্যও তাদের মনে একটু ধিক্কার হয় না, ঘৃণাবোধ হয় না, লজ্জা হয় না, ক্ষোভ রাগ তোমার মত কিছুই হয় না। ভালুক, তুমি এই বিষয়ে কত মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

তোমার পিঠের উপরের ও বানরটা কি নির্ব্বোধ! ওটাও তোমার মত স্বাধীনতা হারাইয়া দাস হইয়া রহিয়াছে, অথচ সে দিকে লক্ষ্য নাই, দিব্য খেলা আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, তোমার এ যন্ত্রণা দেখিয়াও শিখিতেছে না, গাধাটার মত নীচ ও অধম হইয়া পোষ মানিয়া রহিয়াছে। আবার উল্টে তোমার পিঠের উপর চড়িয়া ঘাড়ের চুল গুলো ছিঁড়িতেছে। আহা! বানর ত বানর! কোন বোধ নাই। দাস হইয়া আবার আমোদ! ছি! আর ওরই বা দোষ কি দিব? মানুষদের মধ্যেই কত লোক অমনতর আছে। চাকর, গোলাম হইয়া আছে অথচ প্রভুর খোসামোদ করিবার জন্য কত খেলাই খেলে। আবার অন্য পরাধীন লোকদের মনে কত কষ্ট দিয়া বাহাদুরী করে। দূর হোক, আর দুঃখ করিতে পারি না। ভালুক! আমি আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না। ঢোল বাজাইয়া ও বাঁশীর শব্দ করিয়া তোমায় যখন নাচাইতে আসিবে আমি তখন সেখানে থাকিব না। তোমার কষ্ট যদি দূর করিতে পারিতাম তাহলেও একটা উপকার করিতে পারিতাম; তাযখন পারিব না, তখন কেবল দুঃখ দেখে আর "আহা! কি দুঃখ!!" বলে লাভ কি? পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে, কেহ যেন কখন কাহারও কাছে ওরূপ নীচ দাসত্ব না করে।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

একটী সহজ কথা।

এক সময়ে আমাদের দেশে মেয়েরা লেখা পড়া শিখিত না। তখন তাহারা কেবল বাড়ীর কাজ করিত, ও সকলেরই সেবাতে জীবন কাটাইত। লেখা পড়া শেখায় যে কি সুখ, কি অপূর্ব্ব আনন্দ, কি পবিত্রতা, তাহা কিছুই জানিত না। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সময় কাটাইত। তখনকার একটী মেয়ে আর এখনকার একটী মেয়ে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে সহজেই চিনা যায়। একজন শান্ত, নম্র, ধীর বটে, কিন্তু মুখে যেন বোকামী নির্ব্বুদ্ধিতা মাখান, হাবা গোবা ভাল মানুষটী, কিছু জানে না, যেন ননীর পুতুলটী; তাকে চারুপাঠের ভাল ভাল কথা বল, হাঁ করিয়া শুনিবে আর অবাক্ হইয়া থাকিবে। আর একজন চালাক, চতুর, স্বাধীন-প্রকৃতি, বুদ্ধি ও প্রফুল্লতা যেন এক সঙ্গে বাস করিতেছে; চক্ষু বাহিরের জিনিস দেখিতেছে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথায় কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। কত প্রভেদ! এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্য উচিত; আর যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের দেশে বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথাও মনে পড়ে—আর অমনি ভয় হয়! মনে হয় যে লেখা পড়া যাহারা শিখিতেছে তাহাদের

মধ্যে অনেক মেয়েরা প্রায়ই একটু স্বার্থপরতা ও ঔদাস্যভাব পাইতেছে। অবশ্য সকলে নয়, কেহ কেহ, হয়ত অনেকেই হইতেছে। আমরা এমন অনেক মেয়ে দেখিয়াছি যাহারা পড়ার জন্য বাড়ীর কাজ কর্ম্মে ঔদাস্য বা তাচ্ছীল্য দেখায়; তাহারা কিছু স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজেদের ভাল খাওয়া, ভাল পোষাক, ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এ সকলের দিকে তাদের বেশী নজর; কিন্তু বাড়ীর সকলকে কিসে সুখী করিব, নিজের অসুবিধা হলেও অন্য সকলকে কিসে ভাল খাওয়ার, ভাল রাখিব, সে দিকে তাহাদের তত আর দৃষ্টি দেখা যায় না। এটা কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা। করুণা পড়িতেছেন আর তাঁর ছোট বোন্‌টা ক্ষুধায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছে; মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, কাজেই উঠিতে পারিতেছেন না। সে সময়েও যে করুণা উঠিয়া ভগিনীটীকে খাওয়াইয়া তার পর গিয়া পড়িবেন, এ আর তাঁর ঘটিতেছে না। নিষ্ঠুরভাবে ভগিনীর কান্না দেখিতেছেন আর মাথা-মুণ্ডু পড়িতেছেন। কাজেই বাপ বাড়ী আসিয়া সমুদয় শুনিয়া রাগ করিলেন। আরও শুনিলেন যে, তাঁর বড় স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে—নম্রতা নাই, বিনয় নাই, শান্তভাব নাই, গরিবের মত চাল চলন নাই, বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁদের মত পোষাকাদির দিকে নজর পড়িতেছে—এ সব কথা শুনিয়া তাঁর বাপ কাজেই সব বৈ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

একি কম দুঃখের কথা? কিন্তু এ রকম ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অভিভাবকেরা (একেইত তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার শত্রু) মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষার বিপক্ষে অনেক নিন্দা করেন। আজ তাই আমরা প্রিয় পাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কোন ক্রমেই তাঁহাদের কেহই উক্তরূপ দোষে না পড়েন। যে বিদ্যার লক্ষ্য উন্নতি, বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া পরকে সুখী করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করা, সেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি তাহার বিপরীত ফলই লাভ করিতে হয়, তবে যে সে বিদ্যাশিক্ষা করা অপেক্ষা না করাও ভাল। এটী অতি সহজ কথা। কিন্তু মানুষ সহজ কথা আবার যত সহজে ভুলিয়া যায়, এমন আর অন্য কথা নয়। এজন্য আমরা আজ ভাল করিয়া এ কথাটী সকলকে মনে করিয়া দিতেছি, যেন সকলে প্রত্যেকের জীবনের ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখেন;—স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক নম্রতা, বিনয়, হৃদয়ের কোমলতা ও পরের ভাল করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং লেখা পড়ার গুণে আরও বাড়িতেছে কি না? লোকের দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু কর্ণ জুড়াইতেছে কি না? লোকে বলিতেছে কিনা "আহা! মেয়েটী যেন স্বর্গের! লেখা পড়ার উপর আমি বড় চটা ছিলাম, এই মেয়েটীকে দেখে কিন্তু আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে"—ইহা প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। ভরসা করি, কথাটী মনে রাখিয়া আমাদের প্রিয় পাঠিকাগণ চলিতে পারিবেন। আমরা ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আরও ভাল ভাল পরামর্শ দিব মনে করিয়াছি।

সত্যের বল।

(বালকের রচনা।)

প্রায়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন। এবং ছোট ছোট পাঠক পাঠিকা দিগের মধ্যেও বোধ হয় অনেকে এরূপ করেন। কেন করেন, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে হয়ত এই উত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে, মারধোরের ভয়ে বা কাহারও কাছথেকে বকুনী খাবার ভয়ে মিথ্যা-কথা বলেন। সত্য কথার ক্ষমতা কত, এতে মানুষকে কেমন দেবতার মত করে এবং একটা সত্য কথা বলিলে পরে কত আনন্দ পাওয়া যায়, এবং দোষ করিয়া যদি তাহা প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে কেমন সেই দোষটা একেবারে চলিয়া যায়, আর মানুষ কেমন ভাল হইয়া যায় এই বিষয়ে একটা গল্প বলিতেছি।

প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর হইল দিল্লী নগরে একজন মুসলমান চোর বাস করিত; সে এমন পাকা চোর ছিল যে তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে এবং হয়ত সহজে বিশ্বাসও করিবে না। সে বড় বড় আমীর, ওমরাও, মহা মহা বাদ্‌সাহের বাটীতেঢুকে টাকা কড়ি, ভাল ভাল জিনিস পত্র সব চুরি করিত। মহা মহা বাদ্‌সার বলিবার মানে এই যে তখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন সেই জন্য তাহারাই খুব টাকা-ওয়ালা লোক ছিলেন। যাহা হউক তাকে কেহই ধরিতে পারেনা। সকলে ভারি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কার বাড়ীতে কখন কি করে তার ঠিক নাই; সকলেই শশব্যস্ত।

একবার সে মন্ত্রীর বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছে। ঘরে ঢুকিবামাত্র লোক জনের সাড়া শব্দ পেয়ে যেমন তাড়া তাড়ি পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে পালাবে অমনি পড়েগিয়ে তার মাথায় ভয়ানক আঘাত পাইল।

সেই জন্য সে ভয়ানক পীড়িত হইল; সে তখন যে কত কাতোরক্তি করিত তাহা আর বলা যায় না। অনেক সময়ে দুঃখের সহিত বলিত যে, "যদি আমি এরূপ না করিতাম তাহা হইলে আর আমার এমন দুর্দ্দশা হইত না।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তাহা হইলে আর কখন এরূপ কাজ করিব না।" যাহা হ'ক সে সে যাত্রায় কোন মতে রক্ষা পাইল। এবং আগেকার মত বলবান হইয়া উঠিল এবং প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চুরি করিতে লাগিল।

একদিন সে একটা লোককে খুন করে। খুন করিবার সময় তাহার কাতরোক্তি ও চিৎকার শুনিয়া তাহার মনে কেমন যেন ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; এবং কিছুতেই সেই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দরবেশের (ধার্ম্মিক লোক) নিকট যাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিল এবং তার পা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে সেই দরবেশের অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা সত্য কথা কহিতে ও ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়িতে বলিলেন এবং তাহাতেই সে ভাল হইতে পারিবে এইরূপও বলিলেন।

সে ঐ কথা শুনিয়া তদনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। খুব সকালে, দুপরবেলা,

ও সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিল। এক দিনও তার নামাজ কামাই যাইত না; এবং সর্ব্বদা সত্য কথা বলিত।

এক দিন সে এক জনের বাটীতে চুরি করিতে গিয়াছে এর মধ্যে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। তখন কি করে, তার নামাজ না পড়িলেই নয়? 'যা হবার তা হবে' এইরূপ ভাবিয়া সে নামাজ পড়িতে লাগিল; তার চীৎকারে গৃহকর্ত্তা আসিয়া দেখেন যে একজন অপরিচিত লোক ঘরের ভিতর চীৎকার করিতেছে; তখনি ত তাকে চোর বলিয়া রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি উহাদের বাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিলে?" সে দরবেশের কথা মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলিল 'চুরি কর্ত্তে'। রাজা একথা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন যে, চুরি ক'রে কি কেউ কখন স্বীকার করে? আর বিশেষ চোরের যখন প্রাণ দণ্ড হয় তাহা জানিয়া শুনিয়া এ লোকটা যখন স্বীকার করিতেছে তখন অবশ্য আর কিছু বিশেষ কারণ আছে। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঠিক করিয়া বল নইলে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে।" চোর তথাপি স্থির হইয়া বলিল "চুরি কর্ত্তে গিয়াছিলাম ইহার মধ্যে সকাল হওয়াতে ধরা পড়িয়াছি।" রাজা তথাপি বিশ্বাস করিলেন না—ভাবিলেন বুঝি কোন দরবেশ তাহাকে ছলনা করিতেছেন। এই মনে করিয়া রাজা সেই চোরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "প্রভু আপনি কে? কৃপা করিয়া এই অভাগাকে বলুন।" তখন সেই কঠিন হৃদয় চোর নিজের পা ছাড়াইয়া বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আত্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত করিল ও পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল "উঃ আমি কি মহাপাপী; সত্যের মর্ম্ম বুঝিতাম না; ঈশ্বরকে মনে করিতাম না; সত্য যে কি ধন তাহা চিনিতাম না, সত্য গ্রহণ করিতাম না। আমি একটী সত্য কথা বলিয়া সম্রাট দ্বারা পূজিত হইলাম ও দরবেশ আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম" এই বলিয়া রাজাকে বলিল "মহারাজ আমাকে শূলে দেন, আমার আর বাঁচিয়া পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করা কোন মতেই উচিত নহে; আমাকে শূলে দেন।"

রাজা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তৎপরে সে এক জন বাস্তবিক দরবেশ হইয়া রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিল আর তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা যত চোর সাধু হইল; এবং মিথ্যাবাদী ধার্ম্মিক হইয়া গেল।

আগামী বৎসরের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।

আগামী বৎসরে 'সখা'র গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে ১০০৲ মূল্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারের মূল্য ১০৲ দশ টাকা; এবং সর্ব্ব নিম্ন পুরস্কারের মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

যাঁহারা রচনা ও চিত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষার বিষয় ও সময় 'সখা'য় যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

'সখা'র গ্রাহক ভিন্ন অন্য কেহ পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক আছেন, তাঁহারা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইয়া দিলে পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

শ্রীযুক্ত চরণ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২নং বেনেটোলা লেন, সখা যন্ত্রে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।